গ্রাম ভাবনা

সুদীপ্ত পোড়েল

গ্রাম ভাবনা

সুদীপ্ত পোড়েল

Essay compilation Gram Bhabna
by Sudipta Porel

প্রথম সংস্করণ ● জানুয়ারি ২০১৮
বইমেলা

প্রকাশক ● সৌরভ মণ্ডল
৪৮/১২ এন এস সি বোস রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪০

দূরভাষ ● ৯৮৩৬৩২৭৫৩৬

ই-মেল ●
manikfakirerbari@gmail.com

প্রচ্ছদ ● প্রণব হাজরা

এই উপন্যাসটিতে বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

অক্ষরবিন্যাস ● সোনু'স ক্রিয়েশন
১৪৪ অরবিন্দ সরণি,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য ● ৩০ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

গ্রামোন্নয়ন ভাবনা, গ্রাম স্বরাজ ও গ্রাম গঠনের কাজ ছিল জাতির জনকের জীবনভর সাধনার নির্যাস। এ.পি. জে আব্দুল কালামের ভাষার 'আমরা ঘুমিয়ে যা দেখি তা স্বপ্ন নয়, যে ভাবনার তাড়না আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সেটাই হল আসলে স্বপ্ন'।

সেই স্বপ্নের ফেরি করে বেড়ান লক্ষ কোটি গ্রাম গঠনের কারিগরের সম্মলিত শ্রম ও সাধনার ফল আজকের গ্রাম ভারত। তবুও সময়ের প্রবাহে চিত্রপট বদলায়। মানুষগুলো পাল্টে যায়। চাহিদার চরিত্রও ভিন্ন মাত্রা পায়। তবে জীবনের মৌলিক চাহিদা ও মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রকরণগুলি নিশ্চিত করা যেমন ছিল প্রারম্ভিক প্রয়াসের অভিমুখ, দিন বদলের ক্ষণে সে পথের মাইলস্টোন পেরোতে হবে উন্নততর জীবনের সন্ধানে।

স্বাধীনোত্তর সাত দশকের কথামালার আজকের অনুচ্ছেদে আত্মমূল্যায়নের পালা। সত্যিই কি গ্রাম অপুষ্টিমুক্ত হয়েছে? নারী, শিশুর? সবার মাথায় ছাদ? হাঁটার উপযুক্ত রাস্তা? পরিবেশ, জৈব বৈচিত্র বাঁচিয়ে রেখেছি? নারীর ক্ষমতায়ন? অন্ত্যজ মানুষের? সামাজিক ন্যায় আর আর্থিক স্বাবলম্বন? জীবিকা আর দারিদ্রমুক্তি? সময়ের দাবিতে বিভিন্ন প্রকল্প এসেছে। চলেও গেছে। গ্রাম তো থেকেই যায়। তার জল, মাটি, মানুষ। আর মাটি ভিত্তিক জীবিকা, জল ভিত্তিক জীবিকা, গাছ ভিত্তিক জাবিকা।

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে জীবন ও জীবিকার উন্নত পরিসরে স্বচ্ছন্দ পদচারণার লক্ষ্যে কিছু ভাবনা ও কর্মসূচির ছোঁয়া রইল এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখপত্র 'পঞ্চায়েতী

রাজ’ পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হল। এগুলি কারো কোনও কাজে এলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ‘কলকাতা প্রকাশন’ এটি প্রকাশের গুরুভার নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

প্রকাশনায় যা কিছু ত্রুটি তা একান্তই আমার এবং সে ত্রুটি মার্জনীয়।

কলকাতা
২৬.০১.১৮

সুদীপ্ত পোড়েল

ঘরে ফেরার পালা

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘের হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের ওপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

প্রাউধন থিওরি অব ডিসেন্ট্রালাইজেশন পড়ে অনেকেই আমরা গ্রাম পরিকল্পনার রঙিন ভাবনার জাল বুনতাম। অর্ন্তজালে হরেক দেশের গ্রাম ভাবনার ছাপ পেতে দিবারাত্র কত মেধাবী পরিশ্রম হয়েছে তাতে। কিন্তু সবকিছুই তো গুলিয়ে গেল পরিকল্পনার কাজে নেমে বাঁকুড়ার মেঠো রাস্তায় ও হুগলির বিল-বাওরের ধারে হাঁটতে শুরু করায়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আমাকে চলতি পরিকল্পনা রচনার (২০১৬) (জি.পি.ডি.পি) দেখ ভালের ভার দিয়েছে দুটি জেলার জন্য। হুগলি ও বাঁকুড়া। একাজ শুরু হয়েছে বাংলার সর্বত্র। ভারত সরকারের নির্দেশে। কিন্তু এই সহভাগী পরিকল্পনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সৃজন, বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছিল বাংলাতেই। তিন দশক আগেই।

ত্রিস্তরীয় প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে হুগলির ২০৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জেলা স্তরের প্রশিক্ষণ শুরু হয় ২০ নভেম্বর, ২০১৬ সালে। হুগলির হরিপালে। এর পর এই প্রশিক্ষিত দলটি গ্রাম

পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনা সহায়ক দলকে (অন্তত সংসদের সংখ্যার তিনগুণ) পরিকল্পনা রচনার খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেন ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। একইভাবে বাঁকুড়া জেলার প্রশিক্ষণটি হয় জেলা শহরে। ৫ ডিসেম্বর। ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের প্রসিক্ষণ শেষ হয় ২০ ডিসেম্বর। হুগলিতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ১০০০০ পরিকল্পনা সহায়ক ও বাঁকুড়ায় ৭৫০০ পরিকল্পনা সহায়ক এই পরিকল্পনা রচনার কাজে জড়িত আছেন।

কিন্তু প্রশিক্ষণের রেশ পাড়া বৈঠক করে মানুষের চাহিদা ও ভাবনাকে পরিকল্পনায় তুলে ধরা ইস্তক বাঁচিয়ে রাখা আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ। চিরকালই গ্রামের কিছু বলিয়ে-কইয়ে মানুষ থাকেন। যারা বলেন বেশি, শোনেন কম। কিংবা এদের স্বলালিত জ্ঞানের সাজানো অভিজ্ঞানের অহংবোধও স্ফুরিত হয় পুরো পরিকল্পনা প্রক্রিয়া জুড়ে। ফলে যারা প্রান্তিক,তারা পাড়া বৈঠকে পৌঁছতে পারে না বা পৌঁছলেও শেষ সারিতে ঠাঁই হয়। সেখান থেকে মূল মঞ্চে তার মনের কথাই পৌঁছতে পারে না। কিংবা গ্রামের সেই বলিয়ে কইয়ে "এলিটরা" যে উচ্চগ্রাম কথা বলে, তার নিচে ঢাকা পড়ে যায় এদের মনের কথা, মুখের ভাষা। তাই পরিকল্পনা আর জনগণের হয়ে ওঠে না। এটাই 'এলিট ক্যাপচার'। গণপরিকল্পনার কেতাবি ধারণা এই এলিট ক্যাপচারের অভিঘাতে 'গণ' বিবর্জিত হয়ে শুধুই 'পরিকল্পনা' হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের আলমারিতে ঠাঁই নেয়। এই এলিটরা হয়তো আমাদের মতো গ্রাম প্রশাসকদের অন্ধের যষ্টির মতো। সব কাজেই লাগে। কিন্তু সহভাগী ধারণায় সাফল্য পেতে গেলে এই 'এলিট বধ' করতেই হবে। এদের আগ্রাসন থেকে পরিকল্পনা বাঁচাতে প্রয়োজনে কৃষ্ণ প্রেরণায় অর্জুনের মতো দর্শনতত্ত্বের আশ্রয় নিতে হবে,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায়জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ ধনেখালি ব্লকে জি.পি.ডি.পি.-র হালহকিকত বুঝতে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রধানের কাছে শুনেছিলাম গ্রাম পরিকল্পনা তিনিই রাত জেগে বানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ সেই এলিট ক্যাপচারের অশনি সংকেত। আমরা বুঝিয়েছিলাম মানুষের অংশ গ্রহণে তৈরি পরিকল্পনার সারমর্ম। দেরিতে হলেও সবাই এ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বুঝেছেন। এখন প্রান্তিক মানুষরা এগিয়ে আসছেন এই গ্রামপরিকল্পনা রচনায় শরিক হতে। আবহমানকালের জড়তা কাটিয়ে এরাও বলেছেন তাদের কথা। গ্রামের কথা।

এদের কথা ভেবেই কি রবিকবি একবার লিখেছিলেন,

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

এবারে আশা জাগিয়েই শুরু হয়েছে গ্রাম পরিকল্পনার কাজ। গত বছর সীমিত পরিসরে শুরু হয়েছিল গণউদ্যোগে গ্রাম পরিকল্পনা রচনার অভিযান। অন্তত আই.পি.পি.ই ব্লকগুলিতে। অনেক বেশি করে উঠে এসেছিল অন্ত্যবাসীদের মনের কথা। ফলেছিল রূপায়ণে। জয়পুরের রাশু লোহারের গোলাপ বাগান সেই গণপরিকল্পনার ফসল। চাকদহ ব্লকে স্বনির্ভর দলগুলির বাড়ি সংলগ্ন ক্ষুদ্র মাছপুকুরে মাগুর চাষ গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন পরিবর্তন এনেছে। বাঁকুড়ার শবর পরিবারগুলি আমবাগান তৈরি করে জীবিকার নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। গৌরীপুরের কুষ্ঠকলোনির বাসিন্দাদের আর ভিক্ষায় বেরোতে হয় না। সিঙ্গুর ইকোপার্ক আগামীদিনে অনেক মানুষের আয়ের উৎস হবে। আগামী বছরে এই ধারা আরও বেগবান হবে।

সর্বত্রই শপথ নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রশিক্ষণের কাজ। কতটা রক্ষিত হবে শপথ। মিলকে কি আগামী বছরে নিঃস্ব দিন যাপনের দৈন্যতা থেকে মুক্তি? কাদা পাঁক মাড়িয়ে মূল রাস্তা পৌঁছানোর নিয়তিকে খণ্ডাতে? অসেচ জমিতে পৌঁছবে জল? 'সবার শৌচাগার' শুধু স্লোগান থাকবে না তো? অপুষ্ট শিশুগুলি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে খেলে বেড়াবে উঠোনে?

এরা সবাই কি টিকা নিয়ে আগামীকে নিরাপদ করেছে? যে মা শিশুর জন্ম দেবে সেইবা রক্তাল্পতায় ভুগবে কেন? রোদবৃষ্টিতে এখনো মাথায় ছাদ নেই অঙ্গাণওয়াড়ি শিশুদের? নাগালে আসবে পানের জল? আরও বিশুদ্ধ হয়ে? সবার মাথায় নিরাপদ ছাউনি জুটবে? অভাবের তাড়নায় বিদ্যালয় ছুট হবে না তো কেউ? বয়োপ্রাপ্তির আগেই ছাদনাতলায় কেন গ্রামের কন্যাশ্রী? এতগুলি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তো জি.পি.ডি.পি।

প্রশিক্ষণ পর্বে সকল অংশগ্রহণকারীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম পর্বের জেলা স্তরে দুইদিনের প্রশিক্ষণের মূল উপজীব্য ছিল প্রথাগত পরিকল্পনা রচনা ও সহভাগী পরিকল্পনা নির্মাণের ফারাক উপলব্ধ করান, সামাজিক ও সম্পদ মানচিত্রের মাধ্যমে প্রথাগত পরিকল্পনার ফাঁকগুলি ভরাট করে সুস্থিত, অন্ত্যজনবাদী, সমতামুখী (sustainable, inclusive, equitable) পরিকল্পনা রচনা। দুটি জেলাতেই চিন্তার ঝড়ের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংজ্ঞা রচনায় উঠে এসেছে অন্তত ৩০-৪০ রকমের দাওয়াই। ভাবতে পারা, ভাবাতে পারা সহভাগী প্রকল্পের বড়ো হাতিয়ার। মানুষ জাড়িত হয় চিন্তায়, চেতনায়, ভাবনায়। যখন প্রশিক্ষার্থীরা নিজ গ্রামের সামাজিক ও সম্পদ মানচিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করলেন, তখন একবাক্যে স্বীকার করলেন প্রথাগত পরিকল্পনায় খামতির কথা। উচ্চবর্ণের পাড়ায় একাধিক সরকারি নলকূপ আর অবহেলিত পাড়ায় একটি বা অকেজো নলকূপের উঠে আসা চালচিত্র এই অনুষঙ্গেরই নির্যাস। ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনার ধারণা প্রথম পর্যায়ে অভাসিত হলেও, এর প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণে। আর এ পর্যায়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ও রাজ্য অর্থ কমিশনের বিষয়টির। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের প্রকল্প রচনার ও শ্রম বাজেট প্রস্তুতির বিষয়টিও সবিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নিজস্ব ও স্থানীয় সরকারি উৎসগুলির ব্যবহারের রূপরেখাও বাতলে দেওয়া হয়।

বর্তমান পরিকল্পনা রচনা প্রক্রিয়ায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সঙ্গো অর্থকমিশন, নিজস্ব অর্থ উৎস সহ বিভিন্ন তহবিলের সংযোগ ঘটাতে পারলে উৎপাদনশীল সম্পদ ও উৎপাদন সহায়ক পরিকাঠামো নির্মাণ সহজতর হবে। চালু প্রক্রিয়ার অভিমুখও সেদিকে। কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে শুধু শ্রম দিবস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিলে হবে না, এই শ্রমদিবস তৈরির মাধ্যমে দুর্বলতর পরিবারগুলির হাতে উৎপাদনশীল সম্পদ তুলে দিতে পারলে দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে বনসৃজনে তিন থেকে পাঁচ বছর যেমন পরিচর্যার জন্যে মাসিক মজুরি নিশ্চিত হয়, তেমনি দুর্বলতর পরিবারগুলি জীবিকামুখী সৃজিত বন থেকে স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পাবে। এমন ভাবনা বেশি বেশি উঠে আসছে পরিকল্পনায়।

শুধু এমন জীবিকামুখী সৃজিত বন অন্তত ১৩ ধরনের হতে পারে। যেমন, (১) জ্বালানি বন (একাসিয়া, ঝুড়ি, শিমুল, বেল ইত্যাদি); (২) ফল বন (আম, পেয়ারা, লেবু, আপেল, কুল, খেজুর, লিচু, বেদানা, সবেদা, কমলা, নারকেল, ড্রাগন ফল, কিউই ইত্যাদি); (৩) ফুল বন (গোলাপ, জবা, গন্ধরাজ, টগর ইত্যাদি); (৪) সবজি বন (সজিনা, পেপে, মোরিঙ্গা, বকফুল, তেঁতুল, আমড়া, চালতা, কামরাঙা, করমচা, কলা, ডুমুর, লেবু, নারিকেল, নিম ইত্যাদি); (৫) মশলা বন (তেজপাতা, সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি); (৬) ওষধি বন (আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, নিম ইত্যাদি); (৭) ঘাস বন (ভেটিভার, স্টাইলো, দিননাথ, নেপিয়া ইত্যাদি); (৮) শিল্প বন (বাঁশ, অর্জুন, বেত ইত্যাদি); (৯) আসবাবকাঠের বন (শাল, সেগুন, গামার ইত্যাদি; (১০) তেল বন (করঞ্জ, ভেরেন্ডা, কেওড়া ইত্যাদি); (১১) সাজান গাছের বন (এরিকা নাট, অরকেরিয়া, পাম, অর্কিড ইত্যাদি); (১২) রঙ বন (পলাশ, নীল, শিউলী ইত্যাদি) (১৩) সুগন্ধি (আগর, সিট্রেইনলা, লিমন ঘাস ইত্যাদি) সহ অনেক ধরনের বন।

এছাড়া সারগাদা তৈরি অন্যতম একটি জীবিকা অর্জনের প্রকল্প। একশো দিনের কাজে এমন সারগাদা তৈরি করে বৃক্ষপাট্টাদারদের বনের পরিচর্যার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে এমন পরিকল্পনা নিলে তৈরি সারের

বিপণণের সমস্যা হবে না। যেমন ভাবে এই প্রকল্পে নির্মিত পশু-পাখির আশ্রয়স্থলের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পগুলি থেকে মিড-ডে মিলে খাবারের জন্য ডিম মাংস সরবরাহের পরিকল্পনা নিলে বিপণনের সমস্যা মিটতে পারে। এমনকী স্বনির্ভর দলগুলি বাড়ি সংলগ্ন ছোটো মাছপুকুরে মাগুর সহ অন্যান্য মাছের চাষে ভালো লাভ পাচ্ছে। জলাধারাটি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এবং মাছ সহ উপকরণগুলি অন্যান্য প্রকল্প থেকে করা যায়। একশো দিনের প্রকল্পে গোচারণভূমি বা ঘাসবনের পরিকল্পনা গোখাদ্যের সমস্যা অনেকটাই সমাধান করবে। বর্তমানে এ্যাজোলা চাষের মাধ্যমে প্রাণীখাদ্য ও সারের জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি কর্মসূচিতে শস্য গোলা তৈরি ফসল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন আবাসন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের স্থায়ী আবাস স্থল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়গুলি চলতি পরিকল্পনায় ঠাঁই পাচ্ছে।

জীবিকা উন্নয়নকে পাখির চোখ করলে এই পরিকল্পনা বৃহত্তর জনসমষ্টির আশা আকাঙ্ক্ষার আধার হয়ে উঠতে পারবে। হুগলি ও বাঁকুড়ার পরিকল্পনার মধ্যে ভালো সংখ্যক জীবিকা উন্নয়ণ কর্মসূচি স্থান পাচ্ছে। চারাঘর তৈরির কাজ স্বনির্ভর দল বা দুর্বলতর পরিবারগুলিকে আয়ের নতুন পথ দেখাচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব পাবে বর্তমান পরিকল্পনয়া।

জল, জমি, জঙ্গল ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প যেমন দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক হবে, তেমনি, অর্থকমিশনের অর্থে পরিকাঠামো ও পরিষেবার ঘাটতিগুলি পূরণ করে সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রাম গঠনের পথে আমরা এগিয়ে যাব। বর্তমান পরিকল্পনা রচনা প্রক্রিয়ায় মূল রাস্তা থেকে বসতি পর্যন্ত সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী স্থায়ী রাস্তা, নিকাশি নালা, সেচের উৎস থেকে ক্ষেত পর্যন্ত পাকা মাঠ নালা, প্রয়োজনীয় ইঁদারা গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

নির্মল গ্রাম গঠনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটি আগামী দিনে যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে। পরিবারিক শৌচাগার তৈরি সম্পন্ন হলে কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাষণের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া

চালু করতে হবে। পানীয় জলের উৎস যেমন নিরাপদ রাখা জরুরি, তেমন নলকূপের চাতাল, জলশোষক গর্ত তৈরি বাকি থাকলে তা চলতি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শ্মশান-কবর সংস্কার, প্রাচীরহীন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সীমানা বরাবর উদ্ভিজ্জ বেড়া তৈরি করার কাজ ধরা হচ্ছে। ভেটিভারের মাধ্যমে নদী-নালার বাঁধ দৃঢ় করা কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। বাঁধ সংরক্ষণ ছাড়া এই ঘাসের পাতা যেহেতু উর্বর গোখাদ্য, এটি প্রাণীখাদ্যের সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। ভেটিভার নির্ভর হস্তসামগ্রী তৈরি গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

হাপা, ৫ শতাংশ মডেল, ফাইভ স্কোয়ার মডেল প্রভৃতি কাজগুলি অধিক সংখ্যায় নেওয়ার ফলে আগামী দিনে সেচ ও জল সংরক্ষণের কাজে গতি আসেব। বাঁকুড়ার কিছু অঞ্চলে জলবিভাজিকা ধারণায় গালি প্লাগিং, লুজ বোল্ডার চেক, কন্টুর নালা, কন্টুর বাঁধন, ৩০-৪০, ৫ শতাংশ, হাপা, চেক ড্যামগুলি তৈরিও সংরক্ষণ, সেচের প্রসারে ও শস্য নিবিড়তা বাড়াতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। গন্ধেশ্বীর নদী পুনরুজ্জীবনে এই কাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বাঁকুড়ার বিড়াই খাল, শুভঙ্কর দাঁড়া, আমোদর নদীর হাল ফেরাতে এবং হুগলি জেলার ক্ষেত্রে দামোদর, ঘিয়া, কুন্তী প্রভৃতি নদীর বিষয়ে চলতি পরিকল্পনায় পদক্ষেপ রাখতে হবে।

বিগত দিনে নির্মিত হুগলি জেলার সিঙ্গুরের ইকোপার্ক, সবুজ দ্বীপ, গড়মান্দারনের মতো পর্যটন পরিকাঠামো এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তেমনি বাঁকুড়া জেলার মুকুটমণিপুর-বারঘুটা পর্যটন কেন্দ্র, শুশুনিয়া ও শুনকপাহাড়ি পর্যটন কেন্দ্র এলাকার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। এমন বিনোদন কেন্দ্র, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র যত বেশি সংখ্যায় তৈরি হবে, তত এলাকার বিকল্প আয়ের পথ তৈরি হবে। এবারের পরিকল্পনায় এমন ভাবনা বেশি করে প্রতিফলিত হবে। মাঠ পরিক্রমা, পাড়া বৈঠক, সম্পদ সামাজিক মানচিত্র বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত পরিকল্পনার নির্যাস ক্ষেত্রভিত্তিক ছকে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট

উপসমিতিতে অনুমোদন করাতে হবে ও যা গ্রাম সভার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের সার্বিক অনুমোদন লাভ করবে।

বিগত তিন দশকের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী পরিকল্পনার কাজ চলেছে। এবছর থেকে সমগ্র ভারত জুড়ে বাধ্যতামূলকভাবে এই প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা রচনা হচ্ছে। সুতরাং রাজ্যের এতদিনের প্রচেষ্টার এটি সর্বভারতীয় প্রতিফলন ও স্বীকৃতি। এই পথেই মিলবে এলাকা ও মানুষের প্রকৃত চাহিদার ও ঘাটতির পূরণ। শেষ কথা এই যে এই সহভাগী পরিকল্পনরা উৎস, বিকাশ ও পরিণতি এ রাজ্যেই। তাই ভারত সরকারের নির্দেশে এ কাজ শুরু হলেও এর সাফল্য আমাদের সেই সৃষ্টি ও সৃজনকেই সম্মানিত করবে। মাঠে ঘাটে পরিকল্পনা রচনার কাজ শেষ হবে ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়ে। একশো দিনের কাজের পরিকল্পনা ডিসেম্বরের মধ্যে। জানুয়ারির দ্বিতীয়ভাগেই মাঠ থেকে ঘরে ফেরার পালা। অবশ্যই 'শরীরে মাটির গন্ধ মেখে' আর 'উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে'। আমাদের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের হাজারো সমস্যার বিশল্যকরণী হতে পারে এই চলতি পরিকল্পনা।

স্মৃতির সরণি থেকে স্বপ্নভোর: একশ দিনের কাজ

আমি মনে করি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প শুধু মজুরি দেওয়ার প্রকল্প নয়, এটি প্রকৃত অর্থে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী। এই শতকের শুরুতে যখন ব্লকে উন্নয়ন আধিকারিক ছিলাম, প্রথম দুই বছর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না ব্লকের দরিদ্র মানুষদের দারিদ্র সীমার ওপরে আনার। কারণ এস. জি. আর.আই-এর স্বল্প বরাদ্দে বছরে হাতে গোনা কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব হত। এরপরই (বিডিও বেলার শেষ দুই বছর) ২০০৬ সালে শুরু হয় মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প।

শুরুর প্রথম দুই বছরে বিপুল উদ্যোগে নিয়ে কাজ শুরু করেও পুরোপুরি ফল দেখে আসতে পারিনি। তারপর অর্ধদশকেরও বেশি সয়মকাল ধরে এই প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ হারাই। আবার বিগত তিনবছর এই প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত রাজ্য আধিকারিক হিসেবে এই প্রকল্প নতুন করে দেখা। সেই দেখা আর উপলব্ধি থেকেই আজকের এই কথামালা। শুরুর সেদিন ও আজকের রূপের ফারাক নিয়ে। প্রায় এক দশক পরে ফিরে দেখি সেদিনের শুরুর অনেক কিছুই আজ পল্লবিত। তৎকালীন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব এম.এন.রায় দেশের মধ্যে প্রথম বাঁকুড়া-১ ব্লকের জগদল্লা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাতিষ্ঠানিক মজুরি প্রদান করার কাজ শুরু করার কথা বলেন। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিসেবে নানা বাধা ও আপত্তি সরিয়ে স্বল্প সময়ে চালু করতে পেরেছিলাম। আজ এক দশক পরে সেই ক্ষুদ্র সংস্করণের ব্যাপ্তি ও সর্বজনীনতা তখন অকল্পনীয় ছিল। আরেকটি বড়ো কাজ ছিল নিজ জমিতে কর্ম নিশ্চয়তা

প্রকল্পে আম বাগান তৈরি। আইনের বিধানে গরিবের জমিতে ছাড়া বনসৃজন হয় না। বাঁকুড়ায় সুবিস্তৃত পতিত জমিগুলি তার ফলে কোনদিন সবুজ হত না, কারণ এই জোতমালিকরা কোনোদিনই নিজ খরচে সবুজায়নে উৎসাহী নয়। অথচ লিজ পদ্ধতিকে চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য পেয়ে বনসৃজনে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। তৎকালীন জেলা শাসক প্রভাত মিশ্র এই বাঁকুড়া-১ মডেল মেনে নিয়েছিলেন। জয়যাত্রা শুরু হয় বাঁকুড়ার আম বাগানের নতুন ইতিহাসের।

তৈরি হয়েছিল একের পর এক আম বাগান। ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষ থেকে গড়ে ওঠা স্বনির্ভর দল, আদিবাসী পরিবারগুলির শ্রমে দ্রুত বেড়ে ওঠা এমন কিছু বাগানের কথা আজও অমলিন আছে স্মৃতিতে। (১) শ্যামপুর মৌজায় ১৫০টি শুড়ি পরিবারের যত্নে ২৪ হেক্টরে ৯০০০ আমগাছ (২) জিরাবছাইদ মৌজায় ৩০টিসংখ্যালঘু পরিবারের যত্নে ৩ হেক্টরে ১২০০ আমগাছ (৩) বাসুলিতোড়ায় মৌজায় ৩২টি তপশীলি পরিবারের যত্নে ৪ হেক্টরে ১২০০ আমগাছ (৪) পচিরডাঙ্গায় ২হেক্টর জমিতে ১৩টি আদিবাসী পরিবারের যত্নে ৫০০ আমগাছ (৫) দামোদরপুরমৌজায় ৩৫টি তপশীলি ১৮ হেক্টর তোড়া জমিতে ৭০০০ আমগাছ (৬) ধঘড়িয়া-সালুনি মৌজার ৩ হেক্টর জমিতে স্বনির্ভর দলের যত্নে ১২০০ আমগাছ (৭) কুমিদ্যায় ২ হেক্টরে ৮০০ আমগাছ একটি স্বনির্ভর দলের দ্বারা (৮) নেকড়াগোড়া-রাঙামেট্টা-কালপাথরে ৩ হেক্টরে জলবিভাজিকা সমিতি দ্বারা ১২০০ আমগাছ এবং (৯) বড়োবাগানে ২০০ আমগাছ সহ আরো ছোটো বড়ো কিছু আমবাগান এই প্রয়াসের খন্ডচিত্র। এই সফল প্রচেষ্টা এক নতুন বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছিল। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হয় একগুচ্ছ ভূমিহীন গরিব পরিবারের। ল্যাটেরাইট মাটিতে এই সাফল্য পরবর্তী একদশকে শুধু বাঁকুড়া জেলায় কয়েকশ বাগান তৈরিতে প্রতিফলিত হয়। বাঁকুড়ার শান্তি শবরের ২০১৭ সালে দেশের মধ্যে সেরা কৃষকের (আমচাষ) সম্মান প্রাপ্তি বাঁকুড়া জেলার আম বিপ্লবের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি। প্রথম বছরে শুধু বাঁকুড়া-১ ব্লকেই ৭০ হেক্টর পতিত জমিতে

ফলের বাগান করে ৩০০টি পরিবারকে ভবিষ্যতের আয়ের ও স্বনির্ভরতায় আঙিনায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সময় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'প্রদান'-এর উদ্যোগে ওয়াডী প্রকল্পে অনেক ফলবাগান গড়ে উঠেছিল। এমনকী রানিবাঁধের শবর পরিবারগুলিকে এরকম প্রকল্পে এনে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হচ্ছিল। হিরবাঁধ সহ বিভিন্ন ব্লকে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এমন কাজে গতি আসে। পরবর্তীকালে জেলা প্রশাসন এই মডেলে জেলায় ৩০০-র বেশি আম বাগান গড়ে তোলে। সারা বাংলায় হাজারের ওপর এমন ফল বাগান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

জলবিভাজিকা ধারণায় ভূমি জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া-১ ছিল পথিকৃত। দু'বছরের মধ্যে জলস্তর ২-১২ ফুট বেড়েছিল বিভিন্ন স্থানে। ব্লককে ২০০৮-০৯ সালে এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার 'ভূমিজল সম্বর্ধন' পুরস্কারে ভূষিত করে। কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী পবন বনশাল ও কৃষি বিজ্ঞানী স্বামীনাথনের উপস্থিতিতে বাঁকুড়া-১ ব্লক সম্মানিত হয়। বাঁকুড়া -১ ব্লকের এই সাফল্য সচক্ষে দেখতে আসেন 'ভারতের জলমানব' রাজিন্দর সিং। অজস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ জলাধার, চেকবাঁধ, পতিত ভূমিতে বন, ৫% মডেল, কন্টুর ট্রেঞ্চ-বাইন্ডিং,৩০-৪০মডেলসহ বিবিধ উপায়ে এই লক্ষপূরণ সম্ভব হয়েছিল।

তবে শুরুর দিকের সে সাফল্যকে নতুন পরিসরে আরও ব্যাপ্ত করতে পারলে জলসংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আনা যাবে। জোড় ও নদী আবার রসসিক্ত হবে বছরভর। গত অর্থবর্ষে গন্ধেশ্বরী, বিড়াই, আমোদর নদী পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। প্রায় শতাব্দীকাল অসংস্কৃত বিড়াই নদীতে জলের ধারা ফিরে আসছে বিস্মরণের ঘোর কাটিয়ে। গন্ধেশ্বীর নদীখাতে জলস্রোত ফিরে আসছে অনেক আন্দোলন আর স্মৃতিকণার ঢাল বেয়ে। দামোদরের মতো নদী অনেক জায়গায় তটরেখাই হারিয়ে ফেলেছিল। কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প ফিরিয়ে দিতে পারছে অনেক কিছুই। পাহাড়ে ঝর্ণাগুলি আবার জলসিক্ত হয়ে উঠছে।

জলবিভাজিকা ও ঝর্ণাধারা উন্নয়ণের মাধ্যমে ভূমিজল ও ভূগর্ভস্থ জলস্তর যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি একাজের সাফল্য কোন না কোন নদী স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত ধারায় সমৃদ্ধ করবে। সফল হবে নদী পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ। জলবিভাজিকা ধারণা বড়ো পরিসরে প্রযুক্ত হয়ে নদী বাঁচানোর কর্মসূচীতে রূপ পেয়েছে। প্রাথমিক ভাবে গন্ধেশ্বরী, বিড়াই ও আমোদর নদীতে এ কাজ শুরু হলেও আস্তে আস্তে অন্যান্য রুগ্ন নদীপথেও সংস্কার ও জলবিভাজিকা ভাবনার ছাপ পড়বে। দার্জিলিং, কলিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের পাহাড় থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধারা আজ হয় শীর্ণকায়া নয়ত মৃত। যা পাহাড়ে জল সংকটকে আরো তীব্র করেছে। এই অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে পাহাড়ে এমন ৬০০ টি ঝোড়াকে বাঁচিয়ে তোলার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে আর এই অর্থবর্ষে জলবিভাজিকা ধারণায় বাঁচিয়ে তোলা যাবে রাজ্যের আরও ছোটোবড়ো ৩০টি নদী। কাজ শুরু হবে ১৫০০টি ক্ষুদ্র জলবিভাজিকার।

ইকোটুরিজমের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া-১ ব্লকে ২০০৬-০৭ সালে সূচিত শুনুকপাহাড়ী ইকোপার্ক এক নতুন ধারার জন্ম দেয়। কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের সাহায্যে এখানে ল্যান্ডস্কেপিং, ফল-ফুল ওষধি গাছের সমাহারে, ক্ষয়িষ্ণু উচ্চটিলাকে পর্যটন রসিকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর দলের সদস্য, দুর্বলতার পরিবারগুলির কাছে আয়ের নতুন দিশা দেখিয়েছে, এই উদ্যোগ। অথচ প্রকল্প শুরুর আগের কাহিনি ছিল শুধু ধ্বংসের। শুনুক পাহাড়ীর এক সময়কার আমলকি হরিতকি বহেড়া সহ বিবিধ ওষধি গাছে পূর্ণ এই সুউচ্চ টিলা পাথর খাদানের দুষ্কৃতিদের হাতে কবেই নেড়া পাহাড়ের খাদানে পরিণত হয়েছিল। সমস্ত এলাকা ঘিরে দিয়ে, এই প্রায় ক্ষয়িত প্রাকৃতিক সম্পদ আবার বনসৃজনের যাদুতে পাখিদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অবশ্যই কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পই এই উদ্যোগের চালিকা শক্তি। এরপরই জেলায় শুশুনিয়া ইকোপার্ক সহ বিভিন্ন পরিবেশে বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা শুরু হয়। এই কর্মসূচিতে জোয়ার আসে রাজ্যে জুড়েই। শুধু পতিত ভূমিই নয়, নদীচরের মতো অব্যবহৃত ও অনাবৃত ভূমিরূপ কার্যকারী সবুজায়ন,

ভূমিউন্নয়নের সুফলে পর্যটয়ন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এমন ভূমি উদ্ধারের উদাহরণ সুবর্ণরেখা- ডুলুংয়ের সঙ্গামে কয়েকশ বিঘা চড়, বর্তমনে কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে রূপান্তরিত ফলবন-সজিবন-ফুলবন ও পর্যটন বাংলোতে। তেমনি গোপীবল্লভপুরের কয়েকশো বিঘার চর। রাইপুরের কংসাবতী -চরে সবুজদ্বীপ, মহিষাদলের হলদি নদীর চরে ম্যানগ্রোভ ঘেরা মনোরম ক্ষেত্র, দিনাজপুরের আত্রেয়ীপারের বা জলপাইগুড়ির সাইলা বনক্ষেত্র, মুর্শিদাবাদের মোতিঝিল সংস্কার জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের এমন প্রয়োগের উদাহরণ।

শুধুমাত্র সবুজায়ন, জলসংরক্ষণ ও ভূমি-উন্নয়নেই কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের বিস্তার শেষ হয়নি। নতুন নতুন দিগন্তও খুলে গেছে। সৃষ্টিশীল চিন্তার মাধ্যমে। এমন একটি বড়ো কর্মসূচী হল কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই থেকে ইঁট তৈরি। এই কাজ প্রথম শুরু হয় ১৫.০৪.১৫ তারিখে, বাঁকুড়া-১ ব্লকের পচিরডাঙ্গা মৌজায় এক একর জমিতে। দৈনিক ৭০০০-২১০০০ (তিনটে দফায় সর্বাধিক) ইঁট তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন ১০ লাখি যন্ত্রে (পঞ্চায়েতের কোন উৎস থেকে এটি কেনা হচ্ছে) এবং পরিবেশবান্ধব কম মূল্যের এই ইঁট উৎপাদন শুরু হয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পাধীন ৪২টি পরিবারের শ্রমে। ইঁটের উৎপাদন মূল্য ২.০৬ টাকা, যার মধ্যে বালি ০.১৪ টাকার, চুন ০.১২ টাকার, জিপসাম ০.২৭ টাকার, ০.৫০ টাকার পরিবহন খরচ, ০.৯২ টাকার শ্রমমূল্য, ০.১১ টাকার বিদ্যুৎ খরচ। চার লক্ষ ইঁট তৈরিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বিনামূল্যের ছাই লাগে ৬২০ ঘনমিটার, ১৬৫ ঘনমিটার বালি বা পাথর চূর্ণ, ১২০ টন চুন, ৭২ টন জিপসাম, ১০৬৪৯ এককের বিদ্যুৎ ও পরিবহন খরচ ২০১৫০০ টাকা। ৩৫০ টাকা/ঘনমিটার চুন ৪০০ টাকা/টন, জিপসাম, ১৫০০ টাকা/টন, বিদ্যুৎ ৪ টাকা প্রতি একক ধরে মোট খরচ ৮২৪০০০ টাকা। শ্রম ও উপকরণের অনুপাত ৪৪.৬৬: ৫৫.৩৪। অবশ্য বিদ্যুৎ ও পরিবহণ লভ্যাংশ থেকে পরিচালিত হলে শ্রম ও উপকরণের অনুপাত দাঁড়ায় ৬৩.৪৫: ৩৬.৫৫। স্থানভেদে পরিবহন খরচা কমলে শ্রমের অনুপাত আরো বাড়বে। অবশ্য প্রথম

মাসটি ছাড়া শ্রমমূল্য বাদে ছাড়া সমস্ত কিছুই লভ্যাংশ থেকে ব্যায় করা হচ্ছে। এই কমমূল্যের ইঁট ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী আবাসের মেঝের মাপ ১০০ বর্গফুটের স্থলে ৩১৫ বর্গফুট করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে সারা রাজ্যে এমন ১১টি প্রকল্প চালু হয়েছে। আরো ১১টি প্রকল্পের কাজ চলছে। ২২টি কেন্দ্র পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন করলে মোট বাৎসরিক ইঁটে উৎপাদন দাঁড়াবে ১৬.৫ কোটি এবং তার জন্যে ছাইয়ের প্রয়োজন ২.৬ লক্ষ ঘনমিটার। পেভার ব্লকের রাস্তা ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এই স্বল্প মূল্যের ইঁট বিশেষ ভূমিকা নেবে। বিপণনের সমস্যাও থাকবে না। শুধুমাত্র রাজ্যে ফি বছর প্রধানমন্ত্রী আবাস তৈরি হয় ৪.৭৪৯ লক্ষের মতো, যার জন্যে প্রয়োজন ২৮৪৯৪ লক্ষের মতো ইঁট। এছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণেও প্রচুর ইঁটের প্রয়োজন।

কর্মনিশচিয়তা প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচিগুলির চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্যই পরিবারগুলিকে দারিদ্রসীমার ওপরে আনা। এই জল-জমি-জঙ্গল কেন্দ্রিক জীবিকা কর্মসূচির সফলতা সমন্বয় কর্মসূচির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এমন কিছু কর্মসূচির তালিকা (১২) গোপালন, ছাগল-হাঁস-মুরগি প্রতিপালন (২) চারাঘর তৈরি (৩) গোচারণভূমি ও অ্যাজোলা চাষ (৪) মাছ, কাংড়া, ঝিনুক-মুক্তো চাষ (৫) সারগাদা তৈরি (৬) বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে অর্থকরী বনের সৃষ্টি (৭) ভেটিভারের বন ও হস্তশিল্প (৮) ইঁট-সিমেন্ট উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ (৯) কঠিন ও বর্জ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে কাজ (১) হাপা, ফাইভ-স্কোয়ার মডেলে কৃষি উন্নয়ন ও সুসংহত চাষে আয় বৃদ্ধি।

মজুরি ভিত্তিক কাজের মাধ্যম সম্পদ তৈরি, সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরির রসায়নেই সম্ভব বহু চর্চিত দারিদ্র দূরীকরণের অধরা লক্ষ্যে পৌছান। ১০০ দিনের কাজে দরিদ্র পরিবার বছরে ১৮০০০ টাকা রোজকার সম্ভব হলেও জাতীয় অর্থ কমিশনের হিসাবে দিনযাপনের জন্য মাসিক প্রয়োজনীয় অর্থ ২৪০০০। এই ফাঁকটুকু পূরণ করা যায় যদি প্রকল্প অর্থে সৃষ্ট সম্পদ পরিকল্পিতভাবে

পরিবারের আয় বৃদ্ধির কাজে লাগান যায়। ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পগুলি একাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আমাদের প্রস্তাবিত সারগাদা (১২.৫* ২.৫*১.৫ ঘনফুট) থেকে বছরে (৪টি পর্বে কেজিতে ৬.২৫-৮ টাকা হারে) ২০০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি সম্ভব। চারাঘরের ক্ষেত্রে ১০০০০ চারাঘরের থেকে অন্যূন ১০০০০ টাকা অতিরিক্ত রোজগার সম্ভব হবে (২৫% পূর্ণবয়স্ক চারা সরকারি ৪ টাকা হারে বা অন্যত্র বাজার মূল্যে) আমবাগানে ১ হেক্টরে একটি স্বনির্ভর দলের পক্ষে বছরে জনপ্রতি ৭০০০০ টাকাও রোজগার সম্ভব। মুরগি পালনে একটি ৫০টি পাখির নির্মিত খাঁচায় বছরে ৩০০০০ টাকা রোজগার আসতে পারে। ছাগল ও হাঁস পালনেও এই রোজকার নিশ্চিত করা সম্ভব। রাজ্যে প্রতিদিন ২.৫ কোটি ডিমের প্রয়োজন থাকলেও প্রত্যেকদিন বাইরে থেকে আনতে হয় ৮০ লক্ষ ডিম যা প্রাণীসম্পদ ও পঞ্চায়েত দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টায় পূরণ করা সম্ভব।

জনপ্রতি মাসিক জীবনধারণের খরচ ২০১১-১২ সালের হিসেবে ১২৭৯ টাকা (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮তম প্রতিবেদন) অর্থাৎ বছরে জনপ্রতি ১৫৩৪৮ টাকা। পাঁচজনের পরিবারে ৭৬৭৪০ টাকা বাৎসরিক রোজকার নিশ্চিত করতে পারলে পরিবারটি আর্থিক স্বচ্ছলতায় উত্তীর্ণ হবে।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে জীবিকা উন্নয়নের কাজের লক্ষ্যমাত্রা হল

(১) সারগাদা	৭৯৫৪২
(২) মাছপুকুর/সেচপুকুর	৭৫৩৩০
(৩) মুরগির পোলট্রি	১৯৫৮১
(৪) ছাগলের বাসা	১১২২৮
(৫) গোরুর আবাসস্থল	৯১৫৪
(৬) শুয়োরের বাসা	১৭১৩
(৭) এ্যাজোলা	১৩০০০
(৮) ফসলের গোলা	৩৭০০০

(৯) চারাঘর	৩৫০০
(১০) বৃক্ষপাট্টা	৪৫০০০
মোট	২৯৫০৪৮

আর্থ সামাজিক সমীক্ষায় রাজ্যে ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা হল ৭৫৬৫৯০০। এদের মধ্যে প্রায় দুর্বলতর ৩ লক্ষ মানুষকে এমন ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে এই অর্থবর্ষেই আনা সম্ভব। উল্লেখ্য প্রত্যেক বছরে প্রায় ৩ লক্ষ উপভোক্তাকে একশ দিনের কাজের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস প্রদান করা হয়। অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু গড়পড়তা ২০০ ব্যক্তি উপভোক্তা এই কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে উপকৃত হবেন। লক্ষমাত্রার অন্তত ৫০% শ্রমদিবস ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পেই তৈরি করা সম্ভব।

বৃক্ষপাট্টা ও নতুন যুগের দিশা

এখন রাজ্যের প্রতিটি রোপিত গাছের (ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে নিজ জমিতে, গুল্ম ও ঘাস ছাড়া) দেখভালোর ও ফলভোগের শর্তে মালিকানা দেওয়া হচ্ছে গরিব পরিবারগুলিকে। রাস্তার ধরে সৃজিত এমন বনের দেখভালোর জন পরিবারটি গাছ প্রতি মাসিক ১০ টাকা করে পাবে (৯০% বেশি গাছ বাঁচিয়ে রাখার শর্তে, খণ্ড জমিতে সৃষ্ট বনের ক্ষেত্রে এই হার ৫ টাকা)। পরিবার পিছু ৫০-২০০টি পাট্টা হিসেবে পরিবারকে দেওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় পাট্টা প্রাপ্ত পরিবার বছরে ২৪০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারে। কয়েক বছর পর এমন বিভিন্ন অর্থকরী বন থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা আয় সম্ভব। বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে উপভোক্তার চাহিদা মোতাবেক ফলের বাগান ছাড়াও কোথায় ফুলের বাগান, কোথায় জ্বালানী বন, আসবাব কাঠের বন, মশলার বন, ঘাসবন, ঔষধি গাছের বন, শিল্প বন, সৌখিন গাছের বন তৈরি হচ্ছে। বাঁকুড়া-জয়পুর, বাগনান ও সন্নিহিত থানায় ফুলের চাষের প্রসার, আলিপুরদুয়ার- উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে মশলা চাষের চল, বীরভূমে ঔষধি গাছের চাষ গোপীবল্লভপুরে চা বাগান আয়ের নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। তসরের চাষ বাঁশ বন, বেত বন,

রাবার গাছের চাষ শিল্প বনের উদাহরণ।

সমন্বয়ে যোগ দেওয়া দপ্তর ও কাজের বহর

সমন্বয়ের মাধ্যমে রোজকার বর্ধক সম্পদ সৃষ্টিতে বিভিন্ন দপ্তরের যোগদান গততিন বছরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণীসম্পদ দপ্তর কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নির্মিত গরিব পরিবারের বাড়িতে প্রাণীপালনের আবাসে প্রয়োজনীয় পশুপাখি সরবারহ করার ফলে এমন পরিবারগুলি স্বচ্ছলতার মুখ দেখছে। প্রকল্পে তৈরি মাছপুকুরে মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় মাছচাষের ফলে পরিবারগুলি ১০০ দিনের মজুরির ওপর আর নির্ভরশীল থাকতে হবে না। উদ্যানপালন ও বনদপ্তর ফলবন, ফুলবন, মশলাবন, কাঠবন সহ বিভিন্ন বনের সৃজনে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ফলে উৎপাদনশীল বন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

শেষ কথা

মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে সম্পদ তৈরির গুরুত্ব বোঝা যায় প্রত্যেক সম্পদের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা ধরে সর্বভারতীয় তথ্যভাণ্ডারে অর্ন্তজলে ছবি রক্ষিত করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও প্রত্যেক কাজের বাধ্যতামূলক সম্ভাব্য প্রভাব বর্ণনার উদ্যোগে। স্পষ্টতই প্রত্যেক সৃষ্ট সম্পদই প্রত্যক্ষভাবে দুর্বলতর পরিবারের জীবিকা সহায়ক হয়ে উঠবে অথবা উন্নীত গ্রামীণ পরিকাঠামো পরোক্ষে জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণে সাহায্য করবে। আগামী দিনে কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে রূপায়িত প্রতিটি প্রকল্পই ‘লাইভলিহুড হাব’ হয়ে উঠবে। নির্মূল হবে দারিদ্র্য।

ভেটিভারের আত্মকথা

আমি ভেটিভার ঘাস। ঘাস বলে আমাকে বিদ্রুপ বা অবহেলা করো না। মাড়িয়েও যেও না। আমি আজ নিজের কথা বলতে বসেছি। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এই আত্মজীবনী পড়াশেষ করে আমার মূল্যায়ন করতে বোসো।

অনেক কাল আগে বাংলায় আমার কদর ছিল। পরিচিতি ছিলাম খসখস ঘাস নামে। তখন আমার মূল থেকে তৈরি মাদুর বাংলার ঘরে ঘরে জানালা দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হত। জলে ভিজিয়ে ঘর ঠান্ডা রাখত। আর শেকড়ের জীবাণুনাশক সুগন্ধে ভরে উঠত ঘর।

একসময় বাংলা আমার কথা ভুলে গেল। দক্ষিণের রাজ্যে ভেষজ চর্চায় আমার নাম হল ভেটিভার। বিজ্ঞানীরা বলেন ভেটিভারিয়াজাই-জানিওডিস। এদিকে বিগত কয়েক দশক ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় আর ভাঙনে অসম বিপন্ন। মাটি ভাঙন রোধে খোঁজ পড়ল আমার। দক্ষিণ থেকে হাজির হলাম অসমে। প্রাণ মন নিয়ে লেগে পরলাম ব্রহ্মপুত্রের পার বাঁধতে। তিন-চারমাসে শিকড় চালিয়ে দিলাম ৪ ফুটের বেশি। জলের প্রবল তোড় থেকে জালের মধ্যে মাটি আটকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। আটকাতে পারলাম কারণ আমার শিকড়ের শক্তি ইস্পাতের একের ছয় ভাগের বেশি। দেড় বছরে ১৪ ফুট নীচে শিকড় চালিয়ে দিতে পারি। ৬-৭ মাস জলে ডুবে থাকলেও মরিনা। ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। তাই আমার রমরমা, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনামে। এমনকী লাটিন আমেরিকার দেশে, জিম্বাবোয়ের মতো গরমে।

দেশে ছাড়া কতদিন। অবশেষে আমার বাংলার ফেরা ২০১২ সালের ২২ নভেম্বর। অসম থেকে এলাম নিজভূমিতে। হুগলি জেলা প্রশাসনের

হাত ধরে। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল ব্লকের উদনা গ্রামে। সাজ সাজ রব দ্বারকেশ্বরের পাড় জুড়ে। জেলা কালেক্টর এসে পরম যত্নে আমাকে পাড় বাঁচানোর, গ্রাম বাঁচানোর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। ২০১৩ সালের বন্যায় অবাক চোখে গ্রামের লোক দেখল আমার কেরামতি। অন্য সব অংশ ফি বছরের মতো ভেঙে খানখান হলেও উদনা গ্রাম আমার হাতে সুরক্ষিত। দুর-দুরান্তের মানুষ দেখতে এল এই ঘাসের যাদু।

আমি অপেক্ষায় থাকলাম হারান গৌরব আবার ফিরে পাওয়ার জন্য। বাংলার মাঠে ঘাটে আবার মাথা তুলব, হাওয়ায় দুলব বলে। অবশেষে ২০১৫ সালে বাংলার সরকার আমাকে স্বীকৃতি দিল। দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান। পুনর্জন্মে। নিজভূমিতে কাজে লেগে জীবন সার্থক করব বলে। ৪৮৫৫ (২১) আর. ডি./ এন. আর .ডি. এ/ ১৮ এস-০৪/০৯ নং আদেশনামা জারি হল ১৫ অক্টোবরে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র নদীবাঁধ সংরক্ষণে, উপকূল ভূমি উদ্ধারে, পতিত জমি উন্নয়নে, তরল বর্জ্য শোধনে, গোচরণভূমি তৈরি, ভেষজ কারণে, হস্তশিল্পের প্রসারে আমার ব্যবহার চেয়ে।

এই উদ্যোগে বেগবান হল সরকার নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গ্রুপ ফর রুরাল আল্টারনেটিভ মুভমেন্টের (গ্রাম) যোগদানের ফলে। এই সংস্থার উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক ভেটিভার বিশেষজ্ঞ পি ভিনসেন্ট ও পল টুয়ঞ্জা তামিলনাড়ু আর অস্ট্রেলিয়া থেকে উড়ে এল বাংলা আমার বাসের উপযোগী কিনা পরখ করতে। এরা সারা বাংলা ঘুরে জলস্রোতের অভিঘাত, আবহাওয়া ও মাটি-জলের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সুন্দবনের প্রত্যন্ত দ্বীপ সহ সর্বত্র আমায় ঘর বাঁধার অনুমতি দেয়। আমি আসলে পলি, বালি, নোনা মাটি, ল্যাটেরাইট মাটিতে, খরাপ্রবণ এলাকা, অতিবৃষ্টি অঞ্চলে, বরফ শীতল উচ্চতায় (১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), নোনা জলেও (৮.৫-১০ পি.এইচ. ই) বাঁচতে জানি।

আমার চেহারা, আয়ুষ্কাল মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হোক। আমার শিকড় ১৫ ফুটের পিরামিডের জালিকা বিস্তারে মাটি ধরে রাখে, ইস্পাতের এক ছয় অংশের শক্তি নিয়ে। বাঁচে থাকতে পারি ১৫-৫০ বছর। আমাকে দিয়ে নদী বাঁধ শক্ত করতে যেখানে কিলোমিটার খরচ ৪-৫ লাখ টাকা, কংক্রিট-সিমেন্টের বাঁধনে খরচ হয় ৫০ লাখ- ১ কোটি। তাই কম খরচে নদী বাঁধ বাঁধতে আমার বিকল্প মেলা ভার। ছয় ইঞ্চি তফাতে সারিতে বসিয়ে এবং ২-৩ ফুট দূরে দূরে একাধিক সারি তৈরি নদীপারে আমাকে রোপণ করতেহয়। ছয় ফুট অন্তরে উল্লম্ব রোপণে (ছয় ইঞ্চির তফাৎ মেনে) আয়তাকার গ্রীড তৈরি করলে আরো ভালো হয়।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি ৫ ফুটের পাতা সোজা রেখে। গোরু ছাগলে তা খেয়ে নিলে ক্ষণিকের কষ্ট ভুলে ২ সপ্তাহের মধ্যে আবার মাথা তুলি। আমার এই কষ্ট তাই আমি মেনে নিতে রাজি। কারণ তা গ্রামে গঞ্জে গোখাদ্যের সমস্যা মেটাতে বড়ো ভূমিকা নেবে। বিশেষজ্ঞেরা রায় দিয়েছেন আমার পাতায় থাকে ৭.৯৩% প্রোটিন, ১.৩৬% ২০.২৪% ক্যালসিয়াম, ০.১৩% ম্যাগনেশিয়াম, ০.১৬% সোডিয়াম, ১.৩৬% পটাশিয়াম, ০.০৬% ফসফরাস, লোহা ৯৯ মিগ্রা প্রতি কেজি, তামা ৪ মিগ্রা কেজি, দস্তা ১৭.৫ মিগ্রা প্রতি কেজি, ম্যাঙ্গানিজ ৫৩২ মিগ্রা প্রতি কেজি। সবুজ পাতা খাদ্য মেলে হেক্টরে ১০-১৫ টন। পাড়ায় পাড়ায় আমার পাতায় পুষ্ট নধর দুগ্ধবতী গবাদি পশু দেখলে বরং আমার মন ভরে যাবে।

অনেকে আমাকে দূষিত তরল বর্জ্য শোধনে ব্যবহার করছে। আমি শিকড়ের সাহায্যে আর্সেনিক, সেলেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, লেড, পারদ, দস্তা, ক্রোমিয়ামের মতো ভারি ধাতু শোষণ করতে পারি। বক্রেশ্বরে, হাওড়া পুরসভায় একাজে ইতিম্ধ্যেই আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভাসমন ভেলায় চাপিয়ে জলায় ভাসিয়ে দেয় আমাকে। জলের মধ্যে শিকড় ভাসিয়ে আমিও দিবি শোষণ করে নিই এই সব ক্ষতিকারক ধাতু।

আমার নির্যাসের সুঘ্রাণের জুড়ি মেলা ভার। তাই পশ্চিমের দেশে নব্বই ভাগ সুগন্ধীতে ব্যবহৃত হয় ভেটিভারের নির্যাস। সাবান ও রূপচর্চার ফেসপ্যাক, গায়েমাখার জালি, শেভিংফোম তৈরিতে কাজে আসি আমি। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে অনেক ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। আমার পাতা থেকে অনেকে ব্যাগ, জুতা, পুতুল, ম্যাট, টুপি সহ বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরি করে। এমনকী জৈব সার তৈরি ও মাশরুমের চাষে, পানীয়ের উপাদান হিসেবেও অনেকে আমাকে ব্যবহার করে। এছাড়া কাগজ ও পার্টিক্যাল বোর্ড তৈরি কাঁচামালও জোগান দিই আমি। আমার শেকড়ের থেকে নিষ্কাষিত তেল মালিশ, জ্বালা নিবারক, শীতলীকরণ সহ বিভিন্ন ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয়। হেক্টরে প্রতি বহুমূল্য তেল মেলে ১০-১৫ কেজি।

নিজের গুণগান হয়ত বেশি গাওয়া হয়ে গেল। এবার আমার কথা ছেড়ে তোমাদের কথা বলি। ২০১৫ সালের আমার উপযোগিতা সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক সরকারি নির্দেশিকা জারি হওয়ার ঠিক আগে ১৬ আগস্ট অজয় নদের অববাহিকায় কেতুগ্রাম-২ ব্লকে নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়তের ভাঙন কবলিত বেগুনখোলা গ্রামে আমার সাহায্যে নিয়ে নদী বাঁধনের কাজের সূচনা করেন পঞ্চায়েত দপ্তরের উপসচিব এবং কাটোয়ার মহকুমা শাসক মৃদুল হালদার। গ্রামের মানুষকে এই ঘাসের উপযোগিতা বোঝাতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন 'গ্রাম' সংস্থার মানিক ফকির। সকলের যোগদানে এক কিমি নদী বাঁধন সম্পন্ন করার ফলে বেঁচে গেছে লাগোয়া বসত বাড়িগুলি। ছবিতে স্পষ্ট হবে ভাঙন কবলিত ও আমর বাঁধনে অক্ষত বসতি।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মাঠে নেমে পড়ে নদীয়া জেলা প্রশাসন। নদীয়া জেলাকে ধন্যবাদ ভাগিরথী, জলঙ্গী, চূর্ণি, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামতী সহ বিভিন্ন নদীপারের ৭৪৪ কিমি জুড়ে আমাকে ব্যবহার শুরু করার জন্য। শুনেছি একশদিনের কাজে এই কাজে ১৪ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হবে। খরচ হবে ৩০ কোটি টাকা। ১২ লক্ষ চারা দিয়ে নদীয়ার ৭৪টি চারাঘরে ৪ কোটি চারা তৈরি হয়েছে গত দশ মাসে।

আমার অঙ্গীকার পিতামহ-প্রপিতামহের আমলের শক্তপোক্ত নদীবাঁধ ফিরিয়ে আনার। আমার পাতা মুল থেকে স্বনির্ভর দলকে প্রশিক্ষিত করে সৌখিন সামগ্রী তৈরির যে প্রকল্প নদীয়া প্রশাসন গ্রহণ করেছে, একসময় তা বাংলার অর্থনীতি বদলে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এরপর আমার নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘোরামারা দ্বীপে। ১৯৭২ সালে যেখানে দ্বীপভূমি ছিল ৯৪১.৭৬ একরের ২০১০ সালে তা ক্ষয়ের ফলে দাঁড়ায় ৪৮৮.৪৩ হেক্টর। অর্থাৎ ৩৮ বছরে বিলীন হয়েছে দ্বীপভূমির অর্ধাংশ। সেই ট্র্যাডিশ সমানে চলেছে। ম্যাপ থেকে মুছে যাওয়া ঠেকাতে আমার ডাক পড়ল যথারীতি। জেলা প্রশাসন আমাদের ১.৫ লক্ষ সদস্যদের দিয়ে শুরু করল মহাযজ্ঞ। সাগর সঙ্গমে গঙ্গা পরিবৃত ক্ষয়িষ্ণু এই দ্বীপের ১৬ কিমি পরিধির ৪ কিমির বেশি জুড়ে আমি বসে গেলাম। বসাল আসলে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের শ্রমিকরা। ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। আর ১ লক্ষ চারার চারা ঘর তৈরি হল ভবিষ্যতে বকেয়া অংশে ঘাস বাঁধনের কথা ভেবে। আমার আগে ডাক পড়েনি। আজ যখন ডাক পড়েছে তখন এই ভগ্নাবশিষ্ট দ্বীপটিকে বাঁচিয়ে রাখা আমার কাছে ধর্মযুদ্ধের মতো। আমার মহান পূর্বপুরুষদের কসম, এ যুদ্ধে জিততেই হবে।

আমার ব্যবহার নদী ভাঙনে সংকটাপন্ন মালদা ও মুর্শিদাবাদে শুরু করতে গত ২২ জুন, ২০১৬ ফারাক্কায় একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ, উপসচিব, দুই জেলার অবর জেলা শাসকদ্বয়, জেলা আধিকারিক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগণ ও বাস্তকারগণ। দুই জেলায় আমায় চারাঘরে বহুগুণিত করে নদীপারে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই দুই জেলাকে দীর্ঘ ভাঙনের অভিশাপ ও ঘরহারাদের দীর্ঘশ্বাস থেকে মুক্ত করা আমার কাছে বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ। এ লড়াই জিততেই হবে।

উত্তরবঙ্গেও আমার পা পড়ল কোচবিহারের তোর্ষা, ধরলা, কালজানির ৪১ কিমি নদীতীরে। খরস্রোতা নদীর তোড় থেকে নদী পার

বাঁচানোর ভাবনা নিয়ে। কোচবিহার-১, কোচবিহার-২, দিনহাটা-১, মাথাভাঙ্গা-২ তুফানগঞ্জ-১ ব্লক জুড়ে এ কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। বস্তুত ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে নদীয়া জেলায় ১০০ কিমি নদীবাঁধ সংরক্ষণের পর কোচবিহারের এই উদ্যোগ দ্বিতীয় বৃহত্তম। সে উদ্যোগ ফলপ্রসু হতেই আমার ঠাঁই মিলল শিলিগুড়ি মহকুমার আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চারাঘরে। এই জেলার বিভিন্ন খরস্রোতা নদীগুলি থেকে ভাঙন ও পারের জমি বাঁচানোর ভবিষ্যত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে। শুনেছি পাহাড়েও নাকি আমার ঠাঁই হবে পাহাড়ের ধ্বস ঠেকাতে। আমি তো ঠান্ডা সহ্য করেও দিব্যি বেঁচে থাকি। তাই পাহাড়েও আমার দিব্যি অবস্থান। এমনকী পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের বালি আটকাতেও আমার জুড়ি মেলা ভার।

এদিকে হুগলির দ্বারকেশ্বর, বর্ধমানের অজয়-দামোদর, বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী নদীবাঁধে আমার ব্যবহার শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয় রামনগরের বড়ো জলাশয়ের পাড় ও পুরুলিয়ার বড়ো জলাধারের কিনারা শক্তপোক্ত করতেও আমার ব্যবহার শুরু হয়েছে। নদীয়া জেলা প্রশাসন মহাসড়কের বিভাজক হিসেবে ও রাস্তার ধার শক্ত করতে আমার ব্যবহার করছে। তারা কুটির শিল্পের কাজে আমার পাতা মূল ব্যবহারের পাশাপাশি গোখাদ্য হিসেবে আমায় ব্যবহার করতে চায়।

আমার পৃথিবীতে জন্মই মানব কল্যাণে। যত বেশি ব্যবহৃত হব, ততই সার্থক হবে আমার মর্ত্য জীবন। তোমাকে আমাকে আরো ব্যবহার করো। আমি ব্যবহৃত হতে চাই। বাংলার নদী, নালা ঊষর প্রান্তরে আমায় ছড়িয়ে দাও। আমি দেব শিশু নই, বর দিয়ে মুশকিল আসান করব। কিন্তু একদিন আমার শরীর ও সত্ত্বা গ্রামজনের কাছে, প্রতিদিনের যাপিত জীবনে অনেক বড়ো আশা ও ভরসা হয়ে বেঁচে থাকবে। সেদিন হয়ত আমায় তোমরা অমৃতের সন্তান বলবে। সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।

বাংলার নদী ও একশ দিনের প্রকল্প

বাংলা নদী মাতৃক দেশ। নদী বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনচর্চার অনেকটা জুড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অজস্র খাল, বিল, নদী, নালা, বাওর, হানা... তার মন, মনন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ নদী সম্প্রদায়ের বৃহদাংশ আজ দৈনতা বিড়ম্বিত। মলিনতা তার গতিতে, শরীরে, জীবনী শক্তিতে। এ দলে যেমন বহু শতাব্দী প্রাচীন নদ-নদী, তেমনই মানুষে হাতে গড়ে ওঠা খালও। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে নদী সমূহের জীর্ণতা মুক্তির সাধনা এই প্রবন্ধে উপজীব্য।

জীর্ণতার উৎস ও প্রকারভেদ

বাংলায় প্রায় শতাধিক বৃহৎ ও মাঝারি নদী আছে যেগুলির উৎস তিন ধরনের উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের হিমবাহ ও পর্বত। অন্তর্গত জলস্রোত পুষ্ট দক্ষিণমুখী নদীসমূহ, পশ্চিমের মালভূমির ভূমিজল পুষ্ট পূর্ব বা দক্ষিণপূর্ব মুখী নদীসমূহ, সামুদ্রিক জোয়ারে পুষ্ট সমুদ্র সংলগ্ন নদী সমূহ। উল্লেখ্য গঙ্গা নদী হিমালয়ের বরফ গলা জল পুষ্ট নদী এবং মালদায় পশ্চিম বাংলায় প্রবেশের পর দক্ষিণমুখী হয় বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

এই সমস্ত নদীর জরাগ্রস্ততার মুখ্য দুটি লক্ষণ হল নদীখাতের জীর্ণতা আর জলপ্রবাহের অপ্রতুলতা। এই দুটি ব্যাধির মিলিত ফল হঠাৎ বৃষ্টিতে দুকুলপ্লাবী বন্যা। বছরের পর বছর পলি সঞ্চয় এবং জলভরণ অঞ্চলে জল মাটি সংরক্ষণের প্রকরণগুলির দৈন্য, যথাক্রমে নদীখাতের দুরবস্থা ও নদী পথে জলের জোগানের অভাব প্রকট করেছে।

কল্যাণ রুদ্র 'বাংলার নদীকথা' শীর্ষক আক গ্রন্থে বাংলার নদীগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'বাংলার নদী সদাই চঞ্চল। ক্রমাগত গতিপথ বদল নয়। জলের স্রোতে ভেসে প্রচুর পরিমাণ পলি আর

সেই পলিতেই বুদ্ধ হয়ে যায় নদীর চলার পথ—তখন নদী পথ ভেঙে নতুন পথ খুঁজে নয়। উত্তরবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে সংকোশ নদী থেকে পশ্চিমে মেচি নদী পর্যন্ত সব খাতই এখন পাথর বালিতে অবরুদ্ধ। একই ছবি দক্ষিণবঙ্গেও। পাগলা —বাঁশুই-দ্বারকা-ব্রাহ্মণী- ময়ূরাক্ষী-অজয়-দামোদর-দ্বারকেশ্বর- শিলাই-রূপনারায়ণ- জলঙ্গী-চূর্ণী-ইচ্ছামতী-বিদ্যাধরী -সরস্বতী-আদিগঙ্গা-সহ এখন মৃতপ্রায়। বর্ষার জলস্রোত প্রতি বছর দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। বানভাসি মানুষ তখন আশ্রয়ের সন্ধানে হয় দিশহারা। বর্ষার পর আস শুখা মরসুম-তখন সেচের জলের জন্য হাহাকার, পানীয় জলের সংকট দেখা দেয় বহু গ্রামে।'

এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। (১) প্রকৃতির খামখেয়ালি আচরণ, যার পেছনে মানুষের অবদানও কম নয়। (২) বিপুল ক্ষয়িত মাটিকণা নদী খাতকে অববুদ্ধ করে চলেছে। (৩) বর্ষায় জলোচ্ছ্বাস ও অন্য সময়ে জল বিরলতা বাৎসরিক বিষয়। (৪) এক সময়ের প্রাণবন্ত নদীগুলি আজ মৃতপ্রায়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণে উঠে আসা বিষয়গুলির গভীরে গেলেই সমস্যার উৎস ও সমাধানের সোনালি আলোর সন্ধান মিলতে পারে।

(খ) প্রকৃতির বুদ্রুরোষ: পৃথিবীর উষ্নতা বাড়ছে। হিমালয়ের বরফ গলছে। ফলে বরফ জলে পুষ্ট নদীপথে জলধারা ক্রমক্ষীয়মান। বিশ্ব উষ্মায়নের পেছনে বিভিন্ন কারণগুলি হল মানুষের অপরিসীম লোভ, অবিবেচক সিদ্ধান্ত ও আচরণ। অপরিকল্পতি নগরায়ন, বনভূমি ধ্বংস, পরিবেশ অবান্ধব ভোগসামগ্রী ও শিল্পের প্রসার কয়েকশো কারণের কণামাত্র। উন্নয়নের নামে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে অস্বীকার করে বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত নিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্ম হয়। বনধ্বংসের কারণে যখন তখন ও বিভিন্ন পরিমাণে বৃষ্টিপাত এই বিড়ম্বনাকে বহুগুণিত করেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার তাড়নায় নদী ও জলপথের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বুদ্ধ করে যেভাবে সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ হয়েছিল; তা

বন্যা, খরা ও মশা-কীট সৃষ্ট মড়ক ডেকে আনে বাংলা জুড়ে। স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর নদীশাসনের প্রক্রিয়া এমন সর্বনাশকে আরও তরান্বিত করে। এমনকী জমিদারি বিলোপ বা ভূমি সংস্কার আইন সীমা অতিরিক্ত খাস জমি অধিগ্রহণের পূর্বে পূর্বতন মালিক শ্রেণি রাতারাতি বিপুল বনধ্বংসের শরিক হয়।

(খ) অবরুদ্ধ নদীখাত: হিমালয় ও ছোটোনাগপুর মালভূমির উচ্চ অববাহিকা থেকে নির্গত নদী সমূহের জলস্রোতের সঙ্গে বিপুল পলি ও কাঁকরের তোড় নদী খাতকেই মজিয়ে দেয়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় উচ্চ উৎসভূমিতে যত বেশি সবুজ আচ্ছাদন কমেছে, বন কেটে বসতি ও কৃষিভূমি তৈরি হয়েছে, মাটির ক্ষয়জনিত ঘোলা জলের প্রবাহ লক্ষিত হয়েছে বেশি। এই ক্ষয়িত মাটির একাংশ নদী পথকে দ্রুত অগভীর ও চর-বাধায় জরাগ্রস্ত করে তোলে। বর্ষার ওপর থেকে বয়ে আসা বিপুল জলরাশি পাড় ভেঙে নতুন পথ খুঁজে নেয়।

(গ) খেয়ালি বৃষ্টি: নির্বিচারে বনসংহারের ফলে বৃষ্টি বিরল হয়ে পড়া বহু স্থানে ক্ষত মেরামতের বড়ো উপায় বনসৃজন ও ভূমি সংরক্ষণের প্রকরণগুলি প্রয়োগ করা। বছরের মোট বৃষ্টিপাত এখনও সর্বত্র জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এর জন্য জল ও ভূমি সংরক্ষণ ধারণার বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ দরকার। বর্তমান বারিপাতের ধরণ দাঁড়িয়েছে বছরের কয়েকদিন অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং অন্য সময়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হালকা বৃষ্টি। তাই এই বৃষ্টি জলের বেশিটাই বাঁচিয়ে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

জনজীবনে প্রভাব: বাংলার পশ্চিমের উচ্চভূমি ও দার্জিলিং -ডুয়ার্সের অনেক জলপদ আজ জলসংকট কবলিত। পানীয় জলের উৎসের সন্ধানে কয়েক মাইল হাঁটতে হয়। অথচ জলের উৎসের সন্নিকটেই প্রতিটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। অনেক বসতিতে মশা-কীট বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব। বহুকাল ধরেই ভোগবাদী সম্প্রসারণের গ্রাসে অবহেলিত হয়েছে জল-জমি-জঙ্গল। বাস্তুতন্ত্র, জৈব বৈচিত্র বিসর্জিত হয়েছে। সেচের জলও মেলে না বহু ক্ষেতে। একফসল ফলানের মতো

জলও না। মাটির নীচের জলস্তর সমৃদ্ধ করার ব্যবস্থা না করে নির্বিচারে সেচ ও গার্হ্যস্থ প্রয়োজনে ভূমিজলের নির্বিচার উত্তোলন ও ব্যবহার বাড়িয়েছে আর্সেনিক-ফ্লোরাইডের দূষণ। এর প্রভাবে সমাজ ও অর্থনীতিতে ক্ষতি ক্রমবর্ধমান।

পরিত্রাণের উপায়: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মজুরি নির্ভর কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে জল-জমি-জঙ্গালের উন্নয়ন ও এই সম্পর্কিত জীবিকার সুযোগকে প্রসারিত করে দারিদ্র দূরীকরণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমন প্রকল্প রূপায়ণ করতে বছরে প্রায় ৬৫০০ কোটি টাকা খরচ করা যাবে অন্যূন ২৩ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করে। কয়েক দশকের জল সংকট জনিত ক্রমবর্ধমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে এই কর্মসূচি বিরাট সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। প্রয়োজন জল-জমি-জঙ্গাল উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ।

গৃহীত ব্যবস্থা: বিগত অর্থবর্ষ থেকে নদী পুনর্জাগরণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বাঁকুড়া, হুগলি জেলায়। প্রথম পর্যায়ে গন্ধেশ্বরী, আমোদর ও বিরাই নদী বাঁচানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়। গন্ধেশ্বরী পুষ্ট হয় মূলত বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, ছাতনা, গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া-২ ব্লকের বিভিন্ন উচ্চভূমির জলে। এই নদীটি বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে দ্বারকেশ্বর নদীতে এসে মিশেছে। বিড়াই নদী ওন্দার পশ্চিমাংশের উচ্চভূমি থেকে নির্গত হয়ে ওন্দা ব্লকের মধ্যেই প্রবাহিত হয়ে বিষ্ণুপুর শহরের অদূরে দ্বারকেশ্বর নদে মিশেছে। এই অর্থবর্ষে পুরুলিয়া জেলায় দ্বারকেশ্বর নদের উপনদী ফুটিয়ারী, সারসা, বেকো, অড়কোষা নদীর সম্বৎসরের জলস্রোত ফিরিয়ে আনতে এই নদীগুলির অববাহিকায় কাজ শুরু হয়েছে হুড়া, কাশীপুর, সাতুড়ি ব্লক।

শুধু তাই নয়। এই অর্থবর্ষে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম জেলার ১৫০০টি ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা উন্নয়নের মাধ্যমে কাঁসাই-শিলাই -দ্বারকেশ্বর-দামোদর অববাহিকায় জলভরন ও মাটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

একই ভাবে দার্জিলিং ও ডুয়ার্সে মৃত ও মৃতপ্রায় ঝরণাগুলি বাঁচিয়ে তোলার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিগত অর্থবর্ষে এমন ৬০টি ঝরণায় কাজ শুরু হলেও এবছর ৬০০টি ঝোড়ায় কাজ শুরু হবে। নিশ্চিত করা হবে পাহাড়ি এলাকায় জল নিরাপত্তা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বালাসন, তিস্তার মতো নদীগুলিতে জলস্থিতি উন্নত হবে আশা করা যায়।

নদী পুনর্জাগরণ ও ঝোরা সংস্কার কর্মসূচির মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিই হল বৃষ্টির জল বিবিধ উপায়ে (বিভিন্ন ধরনে বাধা বাঁধন-সবুজায়ন ও গাড্ডা) মাটির নীচে প্রবেশ করিয়ে মাটি নীচের জলসঞ্চয় ও জলপ্রবাহ সমৃদ্ধ করা। এই প্রত্যাশা মতো মাটির নীচের দিকের ঝরনা-মুখ ও সেচ-পুকুরের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে জলের জোগান দেয়। এই জল ও মাটি সংরক্ষণের বিভিন্ন কাঠামো জল সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা সংরক্ষণের কাজও নিশ্চিত করবে। ফলে নদীতে বিপুল পলি রাশির ভার মুক্ত জলের সাবলীল ও নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিশ্চিত হবে। ১৫০০ জলবিভাজিকা উন্নয়নের কাজ শেষ হলে বৃষ্টিপাতের পর হঠাৎ জলের বিপুল নিম্নমুখী প্রবাহে লাগাম টানা সম্ভব হবে। নিম্ন অববাহিকা এর ফলে বন্যা ও ভাঙনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। উচ্চ অববাহিকায় ও উৎসমূলে জলভরন নিশ্চিত হলে নদী পথে বছরভর অন্তত অন্তঃসলিলা প্রবাহ নিশ্চিত করা যাবে। চালু প্রকল্পে নদীখাতের বালুচরের মতো বাধাগুলি অপসারণ করে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। শুধু সেচের প্রয়োজনে ছোটো নদী বা জাড় মাটির জোড় বাঁধ বা চেক ড্যাম তৈরি করা হয়। নদীপারের বাঁধন সংহত করতে ভেটিভার ঘাস লাগানো হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জল-মাটি সংরক্ষণ কাঠামোগুলি হল গালি প্লাগিং, পতিত জমিতে ফল বন সহ বিভিন্ন বন, ভেজিটেটিভ হেজ, ফিল্ড বাইন্ডিং, কন্ট্যুর ট্রেঞ্চ, কন্ট্যুর বাঁধ, লুস বোল্ডার/স্টোন চেক, গ্যাবিয়ন স্টাকচার, ৩০-৪০ মডেল, হাপা ৫ শতাংশ মডেল, চেক ড্যাম, নদীপাড় বাঁধন ইত্যাদি। আর পার্বত্য অঞ্চলে রিচার্জ পিট, রিচার্জ পন্ড, গালি প্লাগ, স্টোন চেক, ডিভারসন ড্রেন, ড্রেনেজ লাইন ট্রিটমেন্ট, ভেজিটেটিভ হেজিং, বিভিন্ন ধরনের

বনসৃজন ইত্যাদি। ঢাল ও বিভিন্ন উচ্চতা মোতাবেক বিভিন্ন কাঠামোর উপযুক্ততা নির্ণয় করা হয়।

নদী সংস্কার কর্মসূচির প্রভাব:

ওন্দার বিড়াই নদীর সংস্কার কর্মসূচি ইতিমধ্যেই বেশির ভাগটাই সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে প্রথম পর্যয়ে নদীপারের ২ কিমি সীমার অন্তর্গত ক্ষুদ্র জলবিভাজিকাগুলির মধ্যে ৫০০ মতো হাপা নির্মাণ, কয়েকটি লুস বোল্ডা চেক, কয়েকশ কিমি কন্ট্যুর বাঁধ ও ট্রেঞ্চ-বিশেষত সমস্ত বাগান ও সৃজিত বনে ও বনাঞ্চলে। এছাড়া কয়েকটি চেক ড্যাম, ফলবাগানগুলিতে ৩০-৪০ মডেল, নদী খাতের বাদা অপসারণ ও নদীপার বরাবর ভেটিভারের বাঁধন। এখন পর্যন্ত এই আংশিক সম্পন্ন কর্মসূচির ফলেই এবারের মে মাসের প্রথমার্ধে এক দু-পশলা বৃষ্টিতে বিড়াই নদীতে সুস্থিত ও স্থায়ী প্রবাহ দেখা গিয়েছে। একইভাবে গন্ধেশ্বরী ও আমোদর নদী সংস্কারের কাজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে এবং বর্ষারপর এই কাজগুলির প্রভাব অনুভূত হবে বলে আশা কার যায়। বাড়বে সেচের সুযোগে, শস্য নিবিড়তা, জল নিরাপত্তা ও মাটির উর্বরতা। সার্বিকভাবে চাঙ্গা হবে গ্রামীণ অর্থনীতি।

আগামী দিনের দিশা

মহাত্মা গন্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তিনটি পরীক্ষামূলক নদী সংস্কারের কাজ ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় হারিয়ে যাওয়া নদীখাত সংস্কার, নদীপার বাঁধন, নদীর জলপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য অববাহিকা অঞ্চলে জলভরণের কাজ চলছে নিজস্ব গতিতে। বর্তমান ও আগামী অর্থবর্ষে নদী সংস্কারের কর্মসূচি আরও গতি পাবে। পূর্বের জলধারা ফিরে পাবে রায়ডাক, গদাধর, নাপানিয়া, কালজানি, শিল তোর্সা, বুড়ি, তোর্সা হলং, দুধুয়া, ধরলা, করলা, গিলান্ডি, কমলাই, জলঢাকা, ডায়ানা, মূর্তি, নেওরা, ধরলা, ঘিস, লিস, তিস্তা, মেচি, বালাসন, মহানন্দা নাগর, ফুলহার, কুলিক, চিরামতি, মরা টাঙ্গান, পুনর্ভবা, হাড়ভাঙা, কাশিয়ানি, চুকসি, কালিন্দি, পাগলা, ছোটা ভাগীরথী, কুলিক কাহালই, বাঁশলই,

বাবলা, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, উত্তরাসন, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কুঁয়ে, কোপাই, কান্তার, হিংলো, অজয়, কুনুর, খড়ি, গোবরা, ছোট ভৈরব, ভৈরব, সাতকুলি, জলঙ্গী, পাগলাচণ্ডী, ইচ্ছামতী, চকাই, অঞ্জনা, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, বাচকো, ইচ্ছামতী, মরালি, যমুনা, পদ্মা, সুতি, বিদ্যাধরী, নোয়াই, টালিনালা, আদিগঙ্গা, পিয়ালী, মাতলা, গোসাবা, গন্ধেশ্বরী, টাটকো, কুমারী, ফুটিয়ারী, বেকো, কাঁসাচোর, ডাংড়া, থুকড়া, শংকরী, তারাজুলি, চম্পায়ন, কেটিয়া, ডেনাই, কুবাই, তমাল, পারাং, কাটান, সাহাড়জোড়, বন্ধু, কুমারী, কেরো, চরান, জাম, কালাইছু দেব খাল, কানা দামোদর, কানানদী, কৌশিকি, সরস্বতী, কুন্তী, গড়, রাসভরা, ঘিয়া, কেদারমতী, ইলসুরা, সুয়া খাল, হিজলী খাল, আরোরা খাল, কানা মুন্ডেশ্বরী, শেওড়াশ্রুতি, কালিপুকুর, দেশ খাল, বেহুলা, সুবর্ণরেখা, বাঁশিঝোড়, আড়কোশা, পটলৌই, কাঁসাই, চকা, ভৈরববাঁকি, তারাফেনি, জয়পান্ডা, বিরাই, সালি, দামোদর, খড়ি, বাঁকা, গাঙুর, সরস্বতী, ডুলুং, সুবর্ণরেখা, পিছাবনী, রসুলপুর, কেলেঘাই, কপিলেশ্বরী, পাঁচধুপি, দামোদর, মুন্ডেশ্বরী, ডাকাতিয়া খালের মতো অজস্র নদী নালা। সমস্ত জেলা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সুসংহত নদী পুনর্জাগরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে এই লক্ষ্য সার্থক করবে।

শেষ কথা

কর্ণাটক, রাজস্থান, কেরালা, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে স্বল্পমাত্রায় নদী সংস্কার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বাংলায় ব্যাপকতর পরিসরে এইকাজ শুরু হলে তা জাতীয় প্রেক্ষাপটে হবে পথপ্রদর্শকের কাজ। পাহাড়ে ঝোরো সংস্কারের কাজ ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য হতে চলেছে। বিংশ শতাব্দীতে রবি কবি লিখেছিলেন, "আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।" কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে আগামী দিনে সমস্ত নদী হয়ে উঠবে জলপূর্ণ। ঘোর গ্রীষ্মেও নামবে না জল হাঁটুর নীচে।

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে মৎস্য বিকাশ

ভোজন রসিক বাঙালীর রসনা পুরণে মাছের জুড়ি মেলা ভার। তার নিত্যদিনের ভোজন তালিকায় আবশ্যিক অন্তর্ভুক্তি মাছের বিবিধ পদ। এদিকে এই চাহিদা পূরণে বাইরের রাজ্য থেকে মাছ আমদানি ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও এই বৃহদায়তন বরফ সংরক্ষিত মাছ বাঙালীর আদি অকৃত্রিম রসনা তৃপ্তিতে কতটা সফল তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। পুটি, খরশুলা, শোল, আড়, শাল, ল্যাটা, বজনমুড়ি, কালবোশ, সাইফুন, সরপুঁটি, চ্যাং, বেলে, খোলসে, ন্যাদোস, গুঁতে, ব্যাঙ্গোস, পাঁকাল, বান, কুঁচে, কাকশেল, মৌরলা, চাঁদা, দাড়িয়া, চেলা, তেচোখা, খয়রা, ট্যাঁপা, ফলুইয়ের মতো মাছেদের অনেকগুলিই আজ অশ্রুত প্রায়, বিলুপ্ত বা অপ্রতুল। অথচ কয়েক দশক আগেও বাঙালীর পাত কাঁপাত এই মৎস্যকুল। দীর্ঘসময়ে এই পুকুর, ঝিল, বিল, জলাশয়গুলির সংস্কারের অনাগ্রহ ও সঙ্গতিহীনতা, জলভরণ অঞ্চলে বসিত ও বাঁধা এগুলিকে জীর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। যৌথ বা লিজ মাছ চাষের উদ্যোগের অভাব ও উৎপাদনের হারকে দ্রুত নিম্নগামী করে।

গল্পকথা হয়ে যাওয়া সুস্বাদু এই মাছ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব যেমন আমাদের, বাঙলাকে মাছ চাষের স্বয়ম্ভর করতে সরকারি প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ২০০৬ সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে পুকুর খনন ও প্রাচীন বৃহৎ জলাশয়গুলি পুনঃখননের কর্মসূচি নেওয়া হয়। শুরু হয় এই সব জলাধারগুলিতে মাছ চাষের নতুন উদ্যোগ। ২০১৪-২০১৫ সাল থেকে মৎস্য বিভাগ ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বার্ষিক সমন্বয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। বেগ পেয়েছে মাছ উৎপাদনের প্রক্রিয়া। ২০১৪-১৫

অর্থ বর্ষে কর্মনিশয়চতা প্রকল্প থেকে ১৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা এবং মৎস্য বিভাগ থেকে ২২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ধরেএকটি সমন্বিত পরিকল্পনা রচনা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে এই লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয় যথাক্রমে ৮ কোটি এবং ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ সালে সমন্বিত পরিকল্পনায় ১০০ দিনের কাজ থেকে ধরা হয় ১২.৬ কোটি এবং বিভাগের বাজেট থেকে ১১.৩৯ কোটি। বর্তমান অর্থবর্ষে এই বরাদ্দ ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১১.৭৪ কোটি এবং ২.২১ কোটি টাকা। সমন্বয় পরিকল্পনায় যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল সংস্কার করা ও খনিত পুকুরে বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ, খাঁরা তৈরি করে মাছ চারা তৈরি। ঘাটের সংস্কার প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা, মাছ শুকনোর চাতাল তৈরি ইত্যাদি।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে জেলাওয়াড়ি প্রস্তাবিত সমন্বয় বরাদ্দের খতিয়ান এখানে উল্লেখ করা হল।

জেলা	এমজি এনআরইজিএ এঅবদান (লাখ)	বিভাগীয় অবদান (লাখ)	মোট
কোচবিহার	৬০.৮৬	৫.০০	৬৫.৮৬
জলপাইগুড়ি	৫১.২২	৪.২৫	৫৫.৪৭
দার্জিলিং	১০১.০৬	২২.৪৮	১২৩.৫৩
উত্তর দিনাজপুর	৬১.৪৬	৫.১০	৬৬.৫৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	৫১.২২	৪.২৫	৫৫.৪৭
মালদা	৫১.২২	৪.২৫	৫৫.৪৭
মুর্শিদাবাদ	৫১.২২	৪.২৫	৫৫.৪৭
বীরভূম	৬৭.১৭	২২.৩৩	৮৯.৫০
নদীয়া	৬০.৫০	১২.০৩	৭২.৫২
বর্ধমান	৬১.০৭	১৩.৫৩	৭৪.৬০

উত্তর ২৪ পরগণা	৫৬.৪০	৬.৩৫	৬২.৭৫
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৬৪.৬৫	১৭.৬১	৮৫.২৬
হাওড়া	৪৪.৯৫	৫.৩০	৫০.২৫
হুগলী	৫৬.৪০	৬.৩৫	৬২.৭৫
পূর্ব মেদিনীপুর	৬২.৫৭	১৫.৫১	৭৭.৯৮
পশ্চিম মেদিনীপুর	৬৬.৫৭	২২.২৩	৮৮.৮০
বাঁকুড়া	৬৬.৫৭	২২.২৩	৮৮.৮০
শিলিগুড়ি এমপি	১৯.২৯	১.৫০	২০.৭৯
আলিপুরদুয়ার	৪৯.৪২	৩.৯৫	৫৩.৩৭
মোট	১১.৭৩.৮৯	২২০.৭৯	১৩৯৪.৬৮

মাছ চাষের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লক অন্তর্গত রামসাগরগ্রামে। কর্মনিশ্চতা প্রকল্পে ১০০-র বেশি জলাশয় খনন ও সংস্কার কার ফলে এই মৎস্যগ্রামের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি টাকারও বেশি। আর্থিক স্বনির্ভরতা ও মাছে জোগানের পরিসর বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটা একটি বড়ো পদক্ষেপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকশ পরিবার। পারিবারিক উপভোক্তা প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি ছোটো ছোটো জলাশয়ে মাগুর, চাষের মধ্য দিয়ে আয় বাড়ানোর কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছেন নদীয়ার চাকদহ ব্লকসহ বিভিন্ন ব্লকে এবং হুগলীর ধনেখালিসহ বিভিন্ন ব্লকে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্ম নিয়শ্চয়তা প্রকল্পে এই মাছপুকুরের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা আনতে বিভিন্ন স্বনির্ভর দল ও পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে সামিল করা হচ্ছে ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের মাধ্যমে। আর সংরক্ষণ ও বিপণন নিশ্চিত করতে ওন্দায় গড়ে তোলা হয়েছ একটি অত্যাধুনিক কেন্দ্র। এছাড়া ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির বিভিন্ন ব্লকে এর বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য ঝাড়গ্রামে মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে একটি মাগুর চারা উৎপাদন কেন্দ্র

গড়ে উঠছে। এর পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করার জন্য উপকূলীয় জেলাগুলিতে সমন্বয়ের মাধ্যম মাছ শুকানোর চাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে।

এই বিবিধ কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বিপুল আর্থিক জোগানের সুযোগ নিয়ে মাছ চাষের দ্রুত প্রসার ঘটবে। সম্প্রতি ময়না ব্লকে নিচু জমিগুলিতে চাষের অপ্রতুলতাকর কারণে কৃষকেরা মাছ চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। এবং একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এই নতুন ধারায় দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে সরবরাহ কৃত মাছের অর্ধাংশের বেশি এই ব্লক থেকে পাওয়া সম্ভব। আশা করা যায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে আমার মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা লাভ করব। আর এরসঙ্গে প্রচেষ্টা নিতে হবে হারিয়ে যাওয়া মাছগুলিকে আবার ফিরিতে আনতে, বিপুল সংখ্যায়।

নতুন যুগের ভোরে

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস জুড়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পরিকল্পনার রচনার কাজ। যেটি ইংরেজিতে সংক্ষেপে জি.পি.ডি.পি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের চাহিদা, ভাবনা ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পঞ্চায়েত স্তরে প্রাপ্তব্য আর্থিক সম্পদ, মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে নিত্যদিনের সমস্যা, অনেকদিনের চাহিদাগুলিকে পূরণের পরিকল্পনা করা।

এই পরিকল্পনার মুখ্য অংশ জুড়ে আছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প। এছাড়া আছে চতুর্দশ অর্থকমিশন, রাজ্য অর্থকমিশন, আই. এস জি. পি. নিজস্ব আয়ের উৎসগুলি সহ স্থানীয় ও বিশেষ তহবিল। জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল জল, জঙ্গল, জমির উন্নয়ন। আর জল-জঙ্গাল-জমি ভিত্তিকজীবিকার প্রসার। চলিত প্রক্রিয়ায় এই জীবিকা উন্নয়নের কাজকেই পাখির চোখ করতে হবে। মনে রাখা দরকার শুধু মাত্র শ্রমদিবস তৈরি করে দারিদ্র দূরীকরণ করা সম্ভব নয়। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। ২০১৬-১৭ সালের হারে মজুরি পেলে একটি পরিবার বছরে ১০০ দিন কাজ করে ১৭৬০০ টাকা পেতে পারে। এতে পাঁচ জনের পরিবারে মাথাপিছু দৈনিক আয় দাঁড়াবে ৯.৬৪ টাকা। আর যার ৩০-৪০ দিন গড় কাজ পায় তাদের এই মাথাপিছু প্রাপ্তি দাঁড়াবে ৩.৩৭ টাকার মতো, যা একজনের দিনযাপনের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ শ্রমদিবসের বিনিময়ে সৃষ্ট সম্পদকে যদি আয়ের উপযোগী করে দুর্বলতর পরিবারগুলির হাতে তুলে দেওয়া গেলে তা পরিবারটিকে দারিদ্রসীমার ওপরে তুলতে সহায়ক হবে। উদাহরণ হিসেবে জয়পুরের লোহারপরিবারের গোলাপ চাষ রানিবাঁধের শবর পরিবারের আম বাগান, কেঞ্জাকুড়ার বাউরি

পরিবারগুলির ছাই-ইঁট কারখানা, গৌরীপুর কুষ্ট।

কলোনীর পরিবারগুলির বাগিচা, জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের রাভা পরিবারের কমলা-বাগিচা, চাকদহের সংখ্যালঘু পরিবারগুলির বাড়ি সংলগ্ন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে প্রস্তুত হাপায় মাগুর চাষ, বীরভূম জেলার হরিপুর-মহিষাড়ার ভিটে-মাটি উচ্ছিন্ন চিত্রকর পরিবারগুলির মরিজ্ঞা চাষ, ওন্দার রতনপুরের তপশীলি জাতিভুক্ত পরিবারগুলির বেদনা, বাগান, হিঙ্গালগঞ্জ-হাসনাবাদে ড্রাগন ফ্রুটের চাষ, উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে নারিকেল বাগান, বাঁকুড়া সদর ব্লকের হাঁস প্রজনন কেন্দ্র, বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের ১০০ দিনে কাজে তৈরি আশ্রয়স্থলে মুরগি-ছাগল-গাভী পালন, কৃষির সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির সারগাদা তৈরি, গোসাবা ব্লকের পাঁচ বর্গ জমি মডেলের উন্নত জমিতে চাষ ও একাংশের হাপাতে মাছ-কাঁকড়ার চাষ, দার্জিলিঙের উপজাতি পরিবারগুলির কিউই ফল ও রাবার চাষের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাজগুলির পরিবার ভিত্তিক প্রকল্পগুলি থেকে বছরে ৪০ হাজার টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা আয় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া উপকূলবর্তী জেলার মৎস্যজীবীদের মাছ রোদভাজা করার পাকা চাতাল, প্রান্তিক কৃষকদের শস্য গোলার মতো প্রকল্পগুলি আয় বাড়ানোয় সহায়ক হয়েছে।

উল্লেখ্য আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় রাজ্যে ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭১০৮৬৪৯ (মোট গ্রামীণ পরিবারের ৪৫.১২ শতাংশ) এবং এই পরিবারগুলিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে শ্রমের সুযোগ ও ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে আনা অত্যন্ত জরুরি।

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলি মূলত জল, জমি, জঙ্গল সম্পর্কিত। জল সংক্রান্ত অর্থাৎ মাটির নীচে ও ওপরে জলের জোগান, সঞ্চয়, সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি নিতে হবে। সেচের সুযোগ বাড়াতে ও অনাবাদী জমিতে ফসল ফলাতে জলবিভাজিকা ধারণায় ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে নিজ জমিতে হাপা, মাঠকূয়ো, ৫ শতাংশ মডেল, ৩০-৪০ মডেল, ফাইভ স্কোয়ার মডেল

অত্যন্ত কার্যকরী হবে। তাছাড়া এমন হাপার গুচ্ছ মাছপুকুর হয়ে মাগুর চাষের মাধ্যমে অভাবী পরিবারগুলির কাছে আয়ের নতুন উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোনা মাটির সমস্যা কবলিত উপকূল অঞ্চলে ফাইভ স্কোয়ার মডেলও একযোগে ফসল ও মাছ চাষের প্রসারে উল্লেখযোগ্য সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

জমি অর্থাৎ ভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির কাজ চালু পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে পারে এমন প্রকল্প উৎপাদনশীলতা বাড়ায় বা শস্য নিবিড়তা বাড়াতে অবদান রাখতে পারে। পাহাড়ী ও পশ্চিমাঞ্চলে উঁচু-নিচু ভূভাগের অনাবাদী ঢালু অংশকে ধাপ চাষের উপযোগী করে তুলতে, উপকূলের বালিয়াড়ী অঞ্চলের বালির প্রসার রোধে ভেটিয়ারের মতো উদ্ভিজ্জ বেড়া, তড়াই অঞ্চলে নদীবাহিত নুড়ি-বালির প্রকোপ থেকে জমি বাঁচাতে রক্ষা বাঁধ, জলা জমি উন্নতিকরণ বা অনাবাদী তড়া জমিত বিভিন্ন ভূমি সংরক্ষণ কাঠামো (যেমন কন্টুর নালা বা বাঁধ, ৩০-৪০ মডেল, ভটিভার বাধা ইত্যাদি) তৈরির কর্মসূচী নেওয়া যায়। নোনামাটির এলাকায় ফাইভ স্কোয়ার মডেল এক ধরনের ল্যান্ড শেপিং। এই কাজগুলির সঠিক রূপায়ণ জমি থেকে আয়ের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

জঙ্গল অথাৎ গাছ নির্ভর জীবিকা উদ্যোগ এই সহভাগী উন্নয়ন পরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ইতিমধ্যেই বিগত দুই বছর ধরে বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে সবুজায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া (গুল্ম-ঘাসের বন বা ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের গাছসমুহ) বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমেই সমস্ত গাছ বসাতে হবে। বৃক্ষপাট্টার নিয়মে পরিবার পিছু ৫০-২০০ গাছ প্রদান করে তা বাঁচিয়ে রাখার জন্য গাছ প্রতি নির্দিষ্ট হারে পাট্টা প্রাপককে মজুরি দেওয়া হবে। এই মজুরি ৩-৫ বছর পর্যন্ত দেওয়া যায়। সুতরাং এই বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে যেমন ৩-৫ বছর সংশ্লিষ্ট পরিবারের ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা যায়, তেমনি গাছগুলি পূর্ণবয়স্ক হলে সেগুলি থেকে এই পরিবারগুলি বছরভর একটি স্থায়ী নিশ্চিত আয়ের সংস্থান করা যাবে।

স্থানীয়ভাবে কোন গাছটি অর্থকরী হয়ে উঠতে পারে তা বিচার করে নির্বাচনের ভার উপভোক্তাকেই দিতে হবে। তবে বিভিন্ন ধরনের বন ভিত্তিক ভাবনা বা মিশ্রবনের ভাবনা আয়ের সম্ভাবনাকে বহুগুণিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রকম কার্যকরী কিছু বনের উদাহরণ হল (১) ফল বন (আম, পেয়ারা, লেবু, আপেল, কুল, নারকেল, বেদানা, লিচু, সবেদা, কলা, কমলা, তাল, খেজুর, কিউই, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি); (২) জ্বালানী বন (একাসিয়া, ঝুড়ি, শিমুল, বেল ইত্যাদি); (৩) ফুল বন (জবা, গোলাপ, টগর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা ইত্যাদি); (৪) সব্জি বন (সজিনা, আম, তেঁতুল, মোরিঙ্গা, আমড়া, চালতা, ডুমুর, নিম, বকফুল ইত্যাদি); (৫) মশলা বন (তেজপাতা, সুপারি, লবঙ্গা, দারুচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি); (৬) ঘাসবন (ভেটিভার, স্টাইলো, দিননাথ, থেপিয়ার ইত্যাদি); (৭) আসবাব কাঠে বন শাল, সেগুন, গামার ইত্যাদি); (৮) তেলবন (করঞ্জ, ভেরেন্ডা, কেওড়া ইত্যাদি); (৯) শিল্প বন (অর্জুন, নারিকেল, বেত, রাবার, চা, কফি, বাঁশ ইত্যাদি) (১০ ওষধি বন (আমলকি, হরিতকি, নিম, বহেড়া ইত্যাদি); (১১) সাজান গাছের বন (অর্কিড, সাইকাস, অরকেরিয়া, এরিকা পাম সহ)।

এইভাবে জল-জমি-জঙ্গাল নির্ভর প্রকল্পগুলি আয়ের উৎসমুখ খুলে দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে পারবে। এছাড়া মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজগুলির সঙ্গো অন্যান্য দপ্তরের কাজও বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করতে পারলে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের কাজ বেগবান হবে। প্রকল্পগুলির উপকরণ মূল্যের বেশি অংশ অন্যান্য কর্মসূচি থেকে আসলে উৎপাদনশীল সম্পদ বেশি করে তৈরি হবে। বিভিন্ন দপ্তর বছর শুরুর অনেক আগেই আগামী বছরে সমন্বয়ের সঙ্গো কী ধরনের কাজ কত করা সম্ভব তা জানিয়ে দেওয়ার ফলে সমন্বয়ের কাজ আরও দ্রুততর হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে (ক) ব্যক্তিগত শৌচাগার (ক) সেচ পুকুর (গ) সারগাদা (ঘ) অঙ্গানওয়ারী কেন্দ্র নির্মাণ অগ্রাধিকার তালিকা ভুক্ত। কিছু কাজ যেমন সমস্ত নলকূপের যথাযথ

জল নিষ্কাষন ব্যবস্থা (প্লাটফর্ম, নিকাশ পথ ও জলশোষক গর্ত সহ), মাঠকুয়ো, কঠিন ও তরল বর্জ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনা, পাকা মাঠ নালা, সমস্ত শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিজ বেড়া, গোচারণভূমি উন্নয়ন, শ্মশান সংস্কারের কাজ এই প্রকল্পের অনুমোদিত উদ্যোগ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে ভেটিভার ঘাসের মাধ্যমে নদী বাঁধের ভাঙন রোধ। এই ভেটিভারের শিকড় ৬-১৫ ফুট পিরামিডের ন্যায় জালিকা বিস্তার করে এবং এর ক্ষমতা লোহার তারের প্রায় এক চতুর্থাংশ। তাছাড়া গোখাদ্য হিসেবে এর প্রচলন বাড়াতে গোচারণভূমি উন্নয়নে ভেটিভার ব্যবহার করা যেতে পারে। চলিত পরিকল্পনার মধ্যে এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।

সহভাগী পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনার কাজ শুরু হয় নভেম্বর মাসে রাজ্যস্তরে এক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পরবর্তী ধাপে জেলাস্তরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের, যারা ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ সীমার মধ্যে গ্রাম "পঞ্চায়েত পরিকল্পনা সহায়ক দলের" সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবে। ডিসেম্বর মাসে এই সদস্যরা পাড়া/গ্রাম বৈঠকের মাধ্যমে সামাজিক ও সম্পদ মানচিত্র, ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা, কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের শ্রম বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা রচনা করবেন। তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য সংকলনের মাধ্যমে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার অনুমোদনক্রমে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচিত হবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে।

বিগত তিন দশক ধরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনার উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ভারত সরকার এই বছর থেকে দেশের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহভাগী পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনা বাধ্যতামূলক করেছে, যা আমাদের এত দিনের প্রয়াসের একটি স্বীকৃতি। আগামী দিনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণচাহিদা ও ব্যক্তি মানুষের অপ্রাপ্তি দূর করা যাবে বলে মনে হয়। তৈরি হবে পরিকল্পনা রচনার নতুন ধারা। আর রূপায়ণের নতুন ঘরানা।

রাশু লোহার বাঁকুড়ার জঙ্গাল অধ্যুষিত জয়পুর ব্লকের একজন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের প্রান্তিক কৃষক। তাঁর এক চিলতে জমিতে যা ফসল ফলত তাতে সংসার চালান কঠিন। এসময় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প রাশু লোহারকে বাঁচার নতুন দেখায়। ব্লক প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযেগিতায় কাঠা পরিমাণ জমিতে গোলাপ চাষ শুরু করে। যে জমিতে আগে চাষ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটান কঠিন ছিল, সেই জমিতেই এখন গোলাপ চাষ করে রাশু লোহারের বছরে ৫০০০০-৬০০০০ টাকা রোজগার হচ্ছে। (এই ফুল এখন যাচ্ছে বিষ্ণুপুর, আরামবাগের মতো শহরে, স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পর।

বীরভূমের রাজনগর ব্লকের মহিষাগ্রাম ও হরিপুরগ্রাম ঝাড়খণ্ড লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রাম। মাওবাদী আন্দোলনের তীব্রতায় অনেকেই ভিটে মাটি ও জীবিকা উচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিপর্যয় কাটিয়ে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সাহায্যে নতুন ভাবে বাঁচতে পেরেছে এই দুই গ্রামের মানুষ, এই দুই গ্রামে মোরিঙ্গা চাষের মধ্য দিয়ে জীবিকা উন্নয়ন ও পুষ্টির প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই মোরিঙ্গা (সজিনা প্রজাতির গাছ) চাষে লাভের হার বিঘাতে লাখের কাছাকাছি।

আলিপুরদুয়ারের রাভা সম্প্রদায় মূলত আদি যাযাবর প্রকৃতির উপজাতি সম্প্রদায়। এই যাযাবর জীবন বা যা আদিম ঝুম চাষ থেকে স্থায়ী রোজগারের পথ দেখিয়েছে কর্মনিশয়চতা প্রকল্প। অর্থকরী ফসল কমলালেবু এদের জীবন যাত্রা ও জীবিকাকে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। এক একর জমিতে বার্ষিত লাভ অন্তত ৭০০০০ টাকার মতো।

বাঁকুড়ার খাতড়া-রানিবাঁধ-হিড়বাঁধ ব্লকের সবর পরিবারগুলির মুখে হাসি ফুটিয়েছে গ্রামীণ জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে তৈরি অসংখ্য আম বাগান। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে পতিত জমিতে দীর্ঘ মেয়াদি লিজের মাধ্যমে এই কাজ হাতে নেওয়া হয়। বসনা হয় আম্রপালি- মল্লিকা-

আলফান্সো সহ বিভিন্ন প্রজাতির আম। একদা প্রায় নিরন্ন এই পরিবারগুলি এখন এক হেক্টর আম বাগান থেকে ১.২ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারছে।

নদীয়ার চাকদা ব্লকের সরিফা খাতুনের মতো অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলা আজ স্বনির্ভর হয়েছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে মাগুর চাষের মতো সমন্বয় প্রকল্পের মাধ্যমে। শুধু চাকদা ব্লকেই ৩০০-র মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ছোটো ছোটো হাপায় মাগুর চাষ করে এমন এক একটি পরিবার বছরে ৪৭০০০ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

রানিবাঁধ ব্লকের দরিদ্র আদিবাসী অধ্যুষিত বারিকুল-রাউতাড়া গ্রামের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অর্জুন-আসান গাছ রোপন করে তসর গুটি চাষ করে গ্রামগুলি তসর গ্রামের পরিচিতি পেয়েছে। প্রায় ৯০০টি পরিবার এই কাজে যুক্ত হয়েছে। শুধু তসর থেকে এক একটি পরিবারের আয় অন্যূন ১৭০০০ টাকা। বাঁকুড়ার ওন্দার রতনপুরে তপশীলি জাতিভুক্ত মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকায় গড়ে উঠেছে বেদানা বাগান। উন্নত মানের চারা আনা হয়েছে শোলাপুরের বেদানা গবেষণা কেন্দ্র থেকে। জেলায় ১৫০০০ এই ধরণের চারা রোপণ করা হয়েছে প্রারম্ভিক বর্ষে। এই বাগানগুলি ফল দিতে শুরু করলে এই আদিবাসী পরিবারগুলি নতুন অর্থনৈতিক উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে।

বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগ গড়ে ওঠা প্রথম (১০০ দিনের কাজে) ছাই-ইঁট কারখানা এলাকার ৭০টি বাউরি পরিবারকে বেঁচে থাকার নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। পৌনঃপুনিক অভিবাসনের অভিঘাতে ক্লান্ত এই পরিবারগুলি এখন গ্রামের মধ্যেই তৈরি কারখানায় মালিকানা স্বত্ব সহ অদক্ষ শ্রমিকের কাজে বছরে

পারিবারিক আয় ৭০০০০ টাকার বেশি করতে পেরেছে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এখন ১০টির অধিক এমন কেন্দ্রের কাজ চলছে।

বাসন্তী ব্লকের মতো উপকূলীয় ব্লকের জমিগুলির মূল সমস্যা সারা বছরের নোনা জলের প্রাদুর্ভাব এবং বর্ষায় জলমগ্নতা। এই দুই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের ফাইভ স্কোয়ার মডেল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। বিঘার পাঁচ বর্গমিটার পরিমিত জায়গায় হাপা খনন করে, সেই মাটি দিয়ে অবশিষ্ট অংশ উঁচু করে জলমগ্নতা থেকে রক্ষা করা গেছে। হাপায় সারা বছরের মাছ চাষ ও বাকি জমিতে সব্জি ও ফসলে বার্ষিক লাভ পাওয়া যাচ্ছে অন্তত ৪০০০০ টাকা। প্রায় অনাবাদী জমিখণ্ড এখন তার ভালো আয়ের উৎস।

সবুজে স্বনির্ভর

গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের ভাবনা ও অনুষঙ্গ কীভাবে বাংলার অর্থনীতির মানচিত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে চলেছে তা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। এর পটভূমি রচনা করেছে অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প।

২০১৫ সালে প্রচারিত এক সরকারি নির্দেশনামায় বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে বনসৃজন, বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিটি গাছের মালিকানা নির্দিষ্ট করে তার ফল ভোগের অধিকার, কাঠের ওপর অধিকার, মাসিক জীবিত গাছ প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের মজুরি নিশ্চিত করা হয়েছে। অবশ্য রক্ষণাবেক্ষণের মজুরি ৯০ শতাংশ বা তার বেশি গাছ বাঁচিয়ে রাখলে পূর্ণমাত্রায় এবং তার কমে কিন্তু ৭৫ শতাংশ বেশি বাঁচিয়ে রাখলে অর্ধেক মজুরি পাওয়া যাবে। ৭৫ শতাংশ কম গাছ বাঁচলে কোনও রক্ষণাবেক্ষণের মজুরি পাওয়া যাবে না। ফল ভোগের ক্ষেত্রে সরকারি জমিতে সৃজিত বনের ফল ও কাঠের ৭৫ শতাংশ পাবে পাট্টাদার এবং ২৫ শতাংশ রূপায়ণকারী পঞ্চায়েত। লিজ জমিতেও একইভাবে অধিক স্বত্ব থাকবে পাট্টাদারের এবং ক্ষুদ্র অংশ পঞ্চায়েতের। বাকি অংশ লিজদাতার। এই সিদ্ধান্তের ফলে যেমন গরিব মানুষের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, তেমনই গাছের বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। খুলে গেছে গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের নতুন দিগন্ত।

বৃক্ষপাট্টা চালু করে প্রতিটি গাছের যেমন অভিভাবক নিশ্চিত করা যাবে, তেমনই বেশি আয়ের জন্য একই এলাকায় একই প্রজাতির গাছ লাগালে উৎপন্ন ফলের বিপণন নিশ্চিত করা যাবে। এমন বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বনের তালিকা নিম্নরূপ:

(১) **ফলের বাগান:** ফলের বন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমের বন তৈরিতে

পশ্চিমের ল্যাটেরাইট জেলাগুলিতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বিধান চন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের প্রতিবেদনে দেখা যায় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আমের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ মালদা-মুর্শিদাবাদ সহ অ্যালুভিয়ান মৃত্তিকা অঞ্চলের তুলনায় অনেক ভালো। প্রথাগত ধারণা থেকে বেড়িয়ে এই অঞ্চলের আম বাজার দখল করতে পারছে। এমনকী আরব দেশগুলিতে এর রপ্তানি শুরু হয়েছে। এই অঞ্চলে বিগত এক দশকে এমন হাজারের ওপর বাগিচা তৈরি হয়েছে। স্বনির্ভর হয়েছে কয়েক হাজার পরিবার। আর্থিক সম্ভাবনার কথা ভেবে আরও কিছু ফলের চাষ শুরু করা হয়েছে। যেমন পুরুলিয়ায় আপেল কুল, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং -এ কমলালেবু, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পেয়ারা, ল্যাটেরাইট জেলায় বেদানা, দার্জিলিংয়ে কিউই, বিভিন্ন জেলায় ওষধিগুণযুক্ত ড্রাগন ফলের চাষ, নদীয়ার মতো জেলায় লিচুর চাষ, বীরভূমের রুক্ষ জমিতে আরবের খেজুরের চাষ, দুই চব্বিশ পরগণায়, নদীয়া, পূর্ব মেদিনীপুরে নারিকেল, ফলের উৎপাদন বৈচিত্র্যময় ও অর্থকরী করে তুলেছে।

(২) ফুলের বাগান: ফুলের বাগানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক চাহিদা ও উপযুক্ততা মোতাবেক প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে হবে। যেমন বাগনান, তারাপীঠ সহ বিভিন্ন মন্দির শহরও প্রথাগত যোগানদার এলাকায় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে জবা চাষের প্রসার হচ্ছে। নদীয়া সহ বিভিন জেলায় জারভেরিয়ার মতো রপ্তানীযোগ্য ফুলের চাষে কৃষকের আয় বহুগুণিত হয়েছে। উলবেড়িয়া, জয়পুরসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গোলাপ, রজনীগন্ধার চাষ একই ভাবে অর্থকরী ফসলের পরিচিতি পেয়েছে। বীরভূমে পদ্মচাষের প্রয়াস বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়া দরকার। এমন স্থায়ী গাছ-গুল্ম-লতা থেকে বা মুলকুসুম থেকে ফুলের উৎপত্তি যা অন্তত পক্ষে তিনবার ফসল দেবে তা কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে রুপায়িত হতে পারে। শহরের সন্নিকটে, মন্দিরের কাছাকাছি অঞ্চলে, প্রথাগত উৎপাদক অঞ্চলের আশেপাশে ফুলচাষের প্রসার ঘটাতে হবে।

(৩) মশলার বাগান: মশাল চাষের প্রসার গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে

বিভিন্ন মশলা চাষের ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ভূমিকা নিয়েছে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গে তেজপাতা চাষের বহুল প্রচলন, পাহাড়- ডুয়ার্স, তড়াইয়ে লবঙ্গ—দারুচিনি-গোলমরিচ-এলাচের মতো স্থায়ী গাছের চল বাড়ছে।

(৪) **ওষধির বাগান:** উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ওষধি চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতি উন্নয়নের প্রভূত সম্ভাবনা আছে। রাজ্য ওষধি বৃক্ষ পর্ষদের সঙ্গে সমন্বয়ে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে এবং সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ওষধি বৃক্ষ অধিকরণের সাহায্যে পার্বত্য অঞ্চলে ওষধি চাষের প্রসার ঘটছে। যেমন এ্যালোভেরা, ইপিকাক, চিরতা ইত্যাদি। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে এই ধরনের গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের ও লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলির পুনঃসৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। বীরভূমের রাজনগরে ইতিমধ্যেই বৃহৎ ওষধি খামার গড়ে তোলা হয়েছে। বৃহৎ টিলা বা পতিত জমিতে আমলকি পাহাড়/বন, হরিতকি পাহাড়/বন, নিম টিলা/বনের মতো থিম পার্ক গড়ে তুলতে হবে উদ্যোগ, জীবিকা ও বিপণন সহজতর করার লক্ষ্যে।

(৫) **আসবাব কাঠের বন:** সেগুন, গামার, মেহগনি, শিশু, শিরিষ, আকাশমণি, শাল মতো কাঠের গাছ উন্নত আসবাবও কাঠামো তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এমনকী বট, অশ্বত্থের মতো বড়ো গাছের বিবিধ ও বিশেষ মূল্য আছে। ৫-১০ বছর পর থেকেই প্রথমোক্ত গাছগুলির কাঠমূল্য আসতে শুরু করে। এমন গাছগুলিও দারিদ্র দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

(৬) **জ্বালানী কাঠের বন:** বাবলা, পিটুলি, সুবাবুল, সোনাঝুড়ির মতো গাছ জ্বালানি সমস্যা নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। যেখানে এখনও গ্যাসের সংযোগ নেই, মহিলারা কাঠের সন্ধান দূরের জঙ্গলে দিনের বেশি অংশ ব্যয় করে, সেই এলাকাসমূহে এই উদ্যোগ এ ধরনের পরিবারগুলির সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে অন্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করতে সাহায্য করবে।

(৭) **ঘাস বন:** দীননাথ স্টাইলো, নেপিয়ার, ভেটিভার ঘাসের

জঞ্জাল পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে পশুপুষ্টি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। ভেটিভার ঘাস বর্তমানে নদীবাঁধনের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। এই ঘাসের মূল ১০ মিটার মাটির নীচে পর্যন্ত পিরামিডের ন্যায় জালিকা বিস্তার করে মাটি ধরে রাখে এবং এর শক্তি লোহা তারের প্রায় এক চতুর্থাংশ। কংক্রিট বাঁধনের খরচের একশ ভাগেরও কম খরচ হয় এই ধরনের বাঁধনে, অথচ অনেক বেশি কার্যকর। এই অর্থবর্ষে অন্তত ৭০০ কিমি ভেটিভার বাঁধনের কাজ হবে আশা করা হচ্ছে। ভেটিভারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে উন্নত মানের শৌখিন সামগ্রী ও শিল্পদ্রব্য তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুনতর পথে চালিত করবে। ক্ষমতায়ন ঘটবে বিভিন্ন স্বনির্ভর দল ও দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের।

(৮) শিল্প বন: শিল্প বনের মধ্যে আছে তসর, রেশমের উপযোগী বিভিন্ন গাছের বিস্তার, বাঁশ-বেতের বন, চা-কফি বাগানের প্রসার। ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়ক এমন বিভিন্ন বনসৃজন গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের কাজে বিশেষ সহায়ক হবে।

(৯) সবজি বন: অপুষ্ট শিশুদের পুষ্টি যোগানের ক্ষেত্রে সবজি বাগান অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেবে। ব্লকের শিশুবিকাশ দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে অপুষ্ট শিশুদের তালিকা নিয়ে এই সমস্ত পরিবার, যে সব দুর্বলতর পরিবার সবজি চাষে জড়িত বা আগ্রহী তাদের ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে এনে এমন বাগান তৈরিতে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হবে। স্থায়ী গাছগুলি মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ও মরসুমী বাগান নিজ খরচে বা বাগিচা-উদ্যান পালন দপ্তরের সাহায্যে বড়ো করতে হবে। স্থায়ী গাছগুলি হল সজিনা, মোরিঙ্গা, আমড়া, চালতা, কামরাঙা, করমচা, জলপাই, কারিগাছ, আম (কাঁচা), কাঁঠাল (এঁচোড়), কলা (কাঁচকলা, থোর), পেঁপে (কাঁচা), বকফুল, নিম (কচি পাতার জন্য), তেঁতুল, লেবু (পাতি), ডুমুর প্রভৃতি। এই সব গাছের নীচে ইন্টারক্রপিং হিসেবে আদা, হলুদ, ওল ও অন্যান্য সবজি অন্য প্রকল্পের সহায়তায় করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় ভূমি

উন্নয়ন, সেচের কাজ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকেই করা হবে।

প্রত্যেক ব্লকে, এমনকী গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রিন হাউস গড়ে তোলা দরকার, যাতে করে উন্নত মানের ফলের চারা, ফুল ও এমনকী সবজি চারা উৎপাদন করা সম্ভব। মরসুমী সবজি চারার উৎপাদন ও রোপণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের অর্থে করতে হবে।

(১০) তেল বন: সুন্দরবন অঞ্চলে কেওড়া প্রজাতির ম্যানগ্রোভ রোপণ তেল নির্ভর শিল্প ও জীবিকার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। এই অর্থবর্ষে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫০০০ গঞ্জাম জেলাগত উন্নত কেওড়া চারা রোপণ করা হচ্ছে। এই একটি গাছ থেকে ৩-৪ বঁছর পর থেকে ৭৫-১০০ ফুল পাওয়া সম্ভব হবে এবং ১০০ গাছের পাট্টাদার ১০০০০ পর্যন্ত বছরে ফুল সংগ্রহ করতে পারবে। ১০০০০ ফুল থেকে ১/২ লিটার সুগন্ধি ও ওষধি তেল নিষ্কাষণ করা সম্ভব যার দাম আরব সহ আন্তর্জাতিক বাজারে ১.৮০ লক্ষ টাকা। ১০০০০ ফুলের দামই গঞ্জাম জেলার হিসেবে ১০০০০০ টাকা। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় করঞ্জ, ভেরেন্ডার চাষ যদি বিপণন নিশ্চিত থাকে তবে গ্রহণ করা যেতে পারে জৈব ডিজেল উৎপাদনের জন্য। কোচবিহারের মতো জেলায় আগরের মতো তৈল উৎপাদনকারী গাছের চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করা যেতে পারে। সুতরাং তেল উৎপাদনকারী গাছগুলি জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

(১১) সাজানো গাছের বন: বিভিন্ন হেজ (গুল্ম) গাছ যেমন ইপোমিয়া, ডুরান্ড প্রভৃতি, এরিকা পাম, আরকেরিয়া, পাম সহ বিভিন্ন গাছ যেমন ল্যান্ডস্কেপিংয়ে কাজে লাগবে, তেমনই সরাসরি নার্সারি থেকেও এর বিক্রয়ের বাজার পাওয়া সম্ভব। শৌখিন গাছের সমাহারে ল্যান্ডস্কেপিং ও এই প্রকার বনসৃজন ও চারাঘর অত্যন্ত অর্থকরী হয়ে উঠতে পারে।

সম্প্রতি আম-বেদানা-নারিকেল ছাড়াও পান, আরবের খেজুর, বাওকুক, লিচু, কমলালেবু, ড্রাগন ফ্রুট, কিউই ফল, রাবার, কেওড়া,

ওষধি গাছ, চা বাগান, সেগুন-গামার, তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, গোলাপ, জারভেরা, রজনীগন্ধা, পদ্ম, জবার মতো অর্থকরী ফসলের বনসৃজনের মধ্য দিয়ে গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের কাজে নতুন গতি এসেছে। উল্লেখিত গাছগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা একটু বিস্তারে আলোচনা করলে এই নতুন ধারার জীবিকা ভাবনার একটা দিশা পাওয়া যাবে।

এমন কিছু অর্থকরী বনায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

(১) আম-বেদানা-নারিকেল-লিচু

(২) পান

(৩) আরবের খেজুর

(৪) বাওকুক-কমলালেবু

(৫) ড্রাগন ফ্রুট

(৬) কিউই ফল

(৭) রাবাব

(৮) কেওড়া

(৯) ওষধি গাছ

(১০) চা বাগান

(১১) সেগুন-গামার

(১২) তেজপাতা-লবঙ্গ-দারুচিনি-এলাচ-গোলমরিচ

(১৩) গোলাপ-জারভেরা-রজনীগন্ধা-পদ্ম-জবা

(১৪) এরিকা-পাম

যে ঊষর প্রান্তর অনাবাদী হয়ে জোত মালিকের কাছে বোঝা স্বরূপ ছিল, কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে গাছ ভিত্তিক জীবকিা উন্নয়নে সেখানে সোনা ফলানো গেছে। কিছু ফলের বাগানে অর্থনৈতিক ফলাফলের বিশ্লেষণে সেটা পরিষ্কার হবে। এক একর আম বাগানের ৪০০ গাছে ৭০ শতাংশ নিশ্চিত ফলন ধরলে ৮-১০ বছরের পূর্ণফলনের কালে গাছ পিছু ৭০-১০০ কেজি ফলন ধরে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা রোজগার সম্ভব হচ্ছে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এমন ৫০০০ হেক্টর বনভূমি তৈরি করা সম্ভব

হয়েছে। বেদানা চাষের ক্ষেত্রে গাছ পিছু ২০ কেজি ফলন ধরে একরে এমন ৭ লক্ষ টাকার ফল উৎপাদন সম্ভব। বিগত দুই অর্থবর্ষ ধরে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে এমন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ৫০ একর জমিতে উৎপাদন শুরুর মুখে। আরও একশ একরে এ চাষ সম্প্রসারণ করা হবে। শোলাপুরের বেদানা গবেষণা কেন্দ্রে এই কাজে সাহায্য করছে। এছাড়া কাঁঠাল, বাওকুল, পেয়ারা, জামরুল, কমলালেবুর মতো অর্থকরী ফলের চাষও বাড়ছে। দার্জিলিং, আলিপুরদায়ুর, জলপাইগুড়িতে ১০০ দিনের কাজে সৃজিত বনে একর প্রতি ৪৮,০০০-৬০,০০০ টাকার লেবু উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই বনভূমির মাঝে সবজির ইন্টারক্রপিং করতে পারলে অতিরিক্ত ৩০০০ বেশি আয় করা সম্ভব। এছাড়া বহু মূল্যবান আরবের খেজুর, কিউই, ড্রাগন ফ্রুটের চাষ দুর্বলতর মানুষের ক্ষমতায়নের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। কিউই ফল ৫০-৭০ টাকা বাজারদরে, ড্রাগন ফ্রুট ২০০-২৫০ টাকায় এমনকী বিদেশি বাজারেও বিক্রি হতে পারে। আরবের খেজুরের চাষ শুরু হয়েছে বীরভূম জেলায় এবং একটি গাছ থেকে১০,০০০ টাকার বেশি ফল পাওয়া সম্ভব। দার্জিলিংয়ে কিউই, উত্তর ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় ড্রাগনের ফ্রুটের চাষ শুরু হয়েছে। ড্রাগন ফ্রুটের ক্ষেত্রে একর প্রতি ফলে মূল্য ২,৪০,০০০ টাকার কাছাকাছি পাওয়া যায়।

মশলা বাগানের ক্ষেত্রে এই আর্থিক লাভ আরও বেশি হওয়া সম্ভব। উত্তরবঙ্গে এ ধরনের বনসৃজন শুরু হয়েছে। ওষধি চাষের ক্ষেত্রে একই সম্ভাবনা। হাওড়া জেলায় একশ দিনের কাজে গোলাপ চাষের বিঘা প্রতি উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১,২০,০০০ টাকা।

সুতরাং এটা স্পষ্ট শুধু বৃক্ষপাট্টার মধ্য দিয়ে বনসৃজন করলেই দুর্বলতর মানুষদের দারিদ্রসীমা মানের ওপরে তোলা যাবে না, প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা। সঠিক অর্থকরী বনের নির্বাচন, এক লপ্তে একই প্রজাতির গাছ বসালে উৎপাদনের বাহুল্যের জন্য ক্রেতা পাওয়া ও দাম পাওয়া সহজ হয়। জীবন ও জীবিকাকেই পাখির চোখ করলে অনায়াসেই অর্জুনের লক্ষ ভেদ সম্ভব। প্রতিষ্ঠা হবে সামাজিক সাম্য।

উষরমুক্তি, মাটির প্রতি ভালোবাসা ও মুক্তি স্বপ্ন

সাতের দশক থেকেই রাঢ়ের অনুর্বর প্রান্তরে সবুজের খোঁজ শুরু হয়। ডি. পি.এ.পি, এন.ডব্লু. ডি.পি.আর.এ, হুরিয়ালি, আই.ডব্লু. এম.পি সহ হরেক রকম প্রকল্পের মোড়কে। সময়ের স্রোত আর প্রকল্পের অভিঘাত মানুষের আস্থাকে অনেক সময় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তবুও শেষ হয়নি খোঁজার পালা। সে খোঁজ দিঘল কালো জল টলমল দীঘিতে মাছেদের উচ্ছ্বাসের, ঘাসের বনে দামালের উল্লাসের। হয়ত ভাবনার সজ্ঞাতে শস্য নিবিড় হয়নি ক্ষেত-উষরতা ঘুচিয়ে, সেচ সেবিত হয়নি বৃষ্টিস্নাত মাঠ, বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়নি শস্যের ডালি, ঘোচেনি অনুর্বরতার অভিশাপ। তবু প্রাপ্তিও কিছু অকিঞ্চিৎকর ছিল না। জলবিভাজিকা উন্নয়ন ধারণায় উষরতা মুক্তির সাধনা কোথাও কোথাও বিশ্বাস জাগিয়েছে, মানুষের মনে। মাটির হারানো গৌরব ফিরেছিল অনেক টাঁড়, বাইদ, কানালী, বহাল জমিতে। সবুজের ভাষায়।

এক দশক আগে শুরু হওয়া মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে জল, মাটি, গাছই হল মুখ্য উপজীব্য। জন চাহিদা মতো টাকার জোগানও অফুরান। এইদুই সত্যের যাদুতে বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করার সোনালি সুযোগ এসেছে। আগামী চার বছরে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলার চিহ্নিত ৫৫টি ব্লকের (পুরুলিয়ার সব ব্লক, বাঁকুড়ার খাতড়া ও সদর মহকুমার সমস্ত ব্লক, পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ ও সালানপুর ব্লক ছাড়া সব ব্লক, ঝাড়গ্রামের সমস্ত ব্লক, পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়ারী ও শালবনী, বীরভূমের রাজনগর, দুবরাজপুর, ইলমবাজার, খয়রাশোল সিউড়ি-১ ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত) ৪৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের

২০০০টি ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা উন্নয়নের মাধ্যমে জল, মাটি ধরে রেখে ক্ষেতে জলের যোগান, কুয়োতে জলস্তর, সেচের ও শস্যের ব্যাপ্তি, জোড়-নদীর সম্বৎসরের সুস্থিত প্রবাহ, শস্য বৈচিত্র্য ও নিবিড়তা, গবাদি পশুর সংখ্যা ও খাদ্য, মাটির পুষ্টি ও মানুষের জীবিকা সমৃদ্ধ হবে।

২০১৭ সাল থেকে যে পাঁচ জেলায় ৫৫ ব্লকের ৪৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জল সঞ্চয় মহাযজ্ঞ শুরু হচ্ছে, তার ভৌগলিক ব্যাপ্তি ও মুখ্য নিকাশী পথ নিম্নরূপ।

(১) বীরভূম জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদী গুলির নাম
১	রাজনগর (২২১.২বর্গকিমি)	৫	৪১	ময়ুরাক্ষী, সিদ্ধেশ্বরী, কুশকাণী
২.	ইলমবাজার (২৫৯.৫ বর্গকিমি)	৯	৪১	অজয়, শাল
৩.	দুবরাজপুর (১৩২.৩২বর্গকিমি)	১০	৬০	শাল, বক্রেশ্বর
৪.	খয়রাশোল (১০৪.৬৮ বর্গকিমি)	১০	৪৮	অজয়, হিংলা
৫.	সিউড়ি-১* (১৫৫.৪ বর্গকিমি)	৭	৩৬	চন্দ্রভাগা
	মোট	৪১	১২৬	

প্রাথমিকভবে সিউড়ি-১ ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের (৩৯.৪৬ বর্গকিমি) কাজ শুরু করা হবে।

(২) পুরুলিয়া জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদী গুলির নাম
১	সাঁতুড়ি (১৭৯.৬৯ বর্গকিমি)	৬	১৮	দামোদর
২.	নেতুড়িয়া (২০৩.৬৫ বর্গকিমি)	৭	১২	দামোদর
৩.	হুড়া (৩৮২.২১ বর্গকিমি)	১০	১২	কাঁসাই, অড়কোষা
৪.	পুঞ্চা (৩৩০.১১ বর্গকিমি)	১০	১০	কাঁসাই
৫.	পুরুলিয়া-২ (৩১০.১০ বর্গকিমি)	৯	৯	কাঁসাই, কারা-মারা
৬.	পারা (৩১২.৫৯ বর্গকিমি)	১০	৮	দামোদর, গবাই, হারাই
৭.	জয়পুর (২৩০.৪৭ বর্গকিমি)	৭	৯	কাঁসাই, গবাই সরজোড়
৮.	কাশীপুর (৪৫.১৩১ বর্গকিমি)	১৩	১২	দামোদর, দ্বারকেশ্বর, বেকো
৯.	রঘুনাথপুর-১ (২০১.৮২ বর্গকিমি)	৭	১০	দামোদর, দ্বারকেশ্বর

১০.	রঘুনাথপুর-২ (১৯৭.৬৭ বর্গকিমি)	৬	১০	দামোদর
১১.	ঝালদা-১ (৩১৫.০৯ বর্গকিমি)	১০	১০	সুবর্ণরেখা, সালদা, রূপাই
১২.	ঝালদা-২ (২৫৬.৬১ বর্গকিমি)	৯	১২	কাঁসাই
১৩	বাগমুন্ডি (৪২৭.৯৫ বর্গকিমি)	৮	১২	সুবর্ণরেখা, কারু, শোভা
১৪.	বড়বাজার (৪১৮.০৬ বর্গকিমি)	১০	১২	কাঁসাই, কুমারী, কাঙ্গাসাই
১৫.	আড়ষা (৩৭৫.০৪ বর্গকিমি)	৮	১২	কাঁসাই
১৬.	মানবাজার-১ (৩৮১.৩২ বর্গকিমি)	১০	১৫	কাঁসাই, চাকা
১৭.	মানবাজার-২ (২৮৫.৮১ বর্গকিমি)	৭	১১	কাঁসাই, কামারী টাটকো, জাম
১৮.	বান্দোয়ান (৩৫১.২৫ বর্গকিমি)	৮	১১	কাঁসাই, টাটকো, যমুনা, গুর্মা
১৯.	পুরুলিয়া-১ (২৮.১৫ বর্গকিমি)	৮	১০	কাঁসাই, কারামারা
২০.	বলরামপুর (৩০০.৯ বর্গকিমি)	৭	১৬	কাঁসাই, কুমারী
	মোট	১৭০	২৩১	

(৩) বাঁকুড়া জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদী গুলির নাম
১	গঙ্গাজলমাটি (৩৬৬.৪৭ বর্গকিমি)	১০	১২	শালি
২	বাঁকুড়া-১ (১৭১.১ বর্গকিমি)	৬	১০	দ্বারকেশ্বর, মাতলা
৩.	বাঁকুড়া-২ (২২০.৮ বর্গকিমি)	৭	৮	গন্ধেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর
৪	ছাতনা (৪৪৭.৪৭ বর্গকিমি)	১৩	৮	দ্বারকেশ্বর
৫	শালতোড়া (৩১২.৬২ বর্গকিমি)	৮	১০	গন্ধেশ্বরী
৬	ইন্দপুর (৩০০.২ বর্গকিমি)	৭	১২	জয়পান্ডা, অড়কোষা, শিলাই
৭	খাতড়া (২৩২.৪ বর্গকিমি)	৭	১০	কাঁসাই, শিলাই
৮.	তালডাংড়া (৩৪৯.৭ বর্গকিমি)	৯	১৬	জয়পান্ডা
৯	রাইপুর (৩৬৪.৪ বর্গকিমি)	১০	৮	কাঁসাই, ভৈরববাঁকি

১০	রনীবাঁধ (৪২৮.৪ বর্গকিমি)	৮	১২	কাঁসাই, ভৈরব-বাঁকি, সুতি, গোল্লা, ধলডাঙ্গা
১১	সারেঙ্গা (২২৮.০৭ বর্গকিমি)	৬	১১	কাঁসাই, গুনাইডা, ডামড়ি, বাঁশির, মাজুড়িয়া, ডোডা, বেলে-পাল সাতবৌনি
১২.	ওন্দা (৫০২.৪৬ বর্গকিমি)	১৫	২০	দ্বারকেশ্বর, বিড়াই
১৩.	সিমলাপাল (৩১০.১৫ বর্গকিমি)	৭	৯	কাঁসাই, শিলাই, জয়পান্ডা, শোভরাজপুর, তারুপুর, আনন্দ-পুর, লাডনা
১৪.	হিড়বাঁধ (২১৫.৬ বর্গকিমি)	৫	১২	কাঁসাই, শিলাই
	মোট	১১৮	১৫৮	

(৪) ঝাড়গ্রাম জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদীগুলির নাম
১	বিনপুর-১ (৩৫৭.৬২ বর্গকিমি)	১০	৮০	কাঁসাই, নোহার, তারফেনী

২.	বিনপুর-২ (৫৮৩.৫ বর্গকিমি)	১০	১০১	ডুলুং, তারফেনী, (যমুনা
৩	জামবনী (৩১৮.৮৩ বর্গকিমি)	১০	৬২	ডুলুং, জাম-দোহরী, পলপালা, বাঁশি
৪	গোপীবল্লভপুর-১ (২৭৫.৮৩ বর্গকিমি)	৭	৫১	সুবর্ণরেখা
৫	নয়াগ্রাম (৫০১.৪৪ বর্গকিমি)	১২	৭৫	সুবর্ণরেখা, মুরারী
৬	সাঁকরাইল (২৭৬.৮ বর্গকিমি)	১০	৪৬	সুবর্ণরেখা, ডুলুং
৭	ঝাড়গ্রাম (৫১৫.১১ বর্গকিমি)	১৩	৯০	কাঁসাই
৮	গোপীবল্লভপুর-২ (১৯২.১৭ বর্গকিমি)	৭	৩৮	সুবর্ণরেখা, ডুলুং
	মোট	৭৯	৫৪৩	

(৫) পশ্চিম বর্ধমান জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদীগুলির নাম
১	ওন্ডাল (৮.৪৮৭ বর্গকিমি)	৮	২১	দামোদর, টামলা, সিঙ্গারান, মইরা, বাঘজোড়া, কেসিপাল

২.	বারাবনী (১৫৬.৩৫ বর্গকিমি)	৮	২৮	অজয়, টুমনি, কুনুর, তমলা
৩	দুর্গাপুর-ফরিদপুর (১৫৫.৯৭ বর্গকিমি)	৬	৩১	অজয়, টুমনি, কুনুর, তমলা
৪	জামুরিয়া (১৫৮.১ বর্গকিমি)	১০	৩৭	অজয়, টুমনি, সিঙ্গারান
৫.	কাঁকসা (২৭৯.৪৪ বর্গকিমি)	৭	৪০	অজয়, দামোদর, কুনুর
৬	পান্ডবেশ্বর (৯৭.৮ বর্গকিমি)	৬	২০	অজয়, টুমনি
	মোট	৪৫	১৭৭	

(৬) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় উষরমুক্তি প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম (আয়তন)	গ্রামপঞ্চা-য়েতের সংখ্যা	জলবিভাজিকার সংখ্যা	মূল নদী গুলির নাম
১	শালবনী (৫৫৩.৩৯ বর্গকিমি)	১০	৫৩	তমাল, পারাং
২	কেশিয়ারী (২৯২.০৯ বর্গকিমি)	৯	৫০	সুবর্ণরেখা, কেলেঘাই, কুশমি
	মোট	১৯	১০৩	

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অংশীদারিত্ব: ভারত রুরাল লাইভলিহুড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রদান, প্রসারী, ডি.আর. সি.এস, আর. ডি এ, সংহিতা মঠ, এল. কেপি, টেগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের

মতো বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ১১টি ৭ সদস্যের দলগঠন করে উষর মুক্তি প্রকল্পাধীন ৫৫টি ব্লকের ৪৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০০ ক্ষুদ্র জলবিভাজিকার ১২লক্ষ হেক্টর এলাকায় প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা রচনা, রূপায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে। সাত সদস্যের দলের মধ্যে থাকবে জল-মাটি-গাছ বিশেষজ্ঞ, জীবিকা উন্নয়ন কর্মী, প্রচার কর্মী। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামস্তরের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ দলের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করবে। তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা প্রতি একজন ধারা সেবক চিহ্নিত করবেন, যাদের এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ধারা সেবকরা হয়ে উঠবেন গ্রাম সমাজের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগসূত্র।

পরিকল্পনা দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন : গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করতে একটি পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ বিষয়ক দল গঠন করা হচ্ছে। এই দলে থাকবে স্থানীয় একশ দিনের কাজের শ্রমিক, ধারা সেবক, স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি, স্থানীয় বাসিন্দা বা কর্মরত মাটি-জল-গাছ বিশেষজ্ঞ। সামগ্রিক ভাবে পরিকল্পনা রচনায় সামিল হবেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ গ্রামের মানুষ ও কৃষক। ছ'টি জেলার প্রকল্প এলাকায় সমস্ত ক্ষুদ্র জলবিভাজিকায় এই দল গঠন অত্যন্ত জরুরি। এদের ৩-৪ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জলবিভাজিকা উন্নয়ন ধারণা ও দক্ষতা তৈরি করা হবে। এই বিষয়টি তদারকি করবে স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্লক প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী দলের সদস্যরা।

প্রশিক্ষণ ও প্রচার পর্ব: প্রচার ও প্রশিক্ষণের পর্ব উষরমুক্তি পরিকল্পনা সফল করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রচারের মাধ্যম পরিকল্পনা অর্ন্তভুক্ত প্রতিটি পরিবারও কৃষকের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা, রূপায়ণের রূপরেখা, বাস্তবায়নোত্তর প্রত্যাশিত ফলাফল পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা এই প্রকল্পের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের সক্রিয় শরিক হয়ে প্রকল্পটির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। এই একাত্ম-বোধই ভাবীকালের সফলতার প্রকৃত রসায়ন হতে পারে। যার অভাবই পুরান

দিনের ব্যর্থতার অন্যতম গুরুতর কারণ। এর জন্য প্রকল্প রচনার পর্বে পাড়া বৈঠক ও গ্রাম পরিক্রমার ক্ষণে বা পূর্বাহ্নে মানুষের আস্থা ও যোগদান নিশ্চিত করা জরুরি। পাড়া বৈঠকে জলবিভাজিকার সাফল্যের বিষয়ে ছোটো ছোটো তথ্যচিত্র, মডেল প্রদর্শন করা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েত এই পাড়া বৈঠক আয়োজনে সাহায্য করবে। জলবিভাজিকা এলাকায় জল-মাটি সংরক্ষণ, শস্য বৈচিত্র্য ও মাটির পুষ্টি বাড়াতে ব্যবহারিক পরিবর্তনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য প্রচারের কাজ লাগাতার চালিয়ে যেতে হবে। পরিকল্পনা রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় ধারণা ও দক্ষতা তৈরিতে গ্রামপঞ্চায়েতের জি.আর.এস, এন.এস, বি.এফ.টি, এস.টি.পি, ধারা সেবক, পরিকল্পনা ও রূপায়ণ দলের ৫ জনকে চার দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

পরিকল্পনা রচনা: নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসজুড়ে মূলত ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা হবে মাঠ পরিদর্শন-সমীক্ষা ও পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে। ধারাসেবক সহ পরিকল্পনা ও তদারকি দলের সদস্যরা এই পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সমস্যা চিহ্নিত করার ও সমাধানের রাস্তা খুঁজতে এই পর্বে গ্রামবাসী, কৃষকসমাজ, স্বনির্ভর দলের যোগদান অত্যন্ত কাম্য। জল-মাটি সংরক্ষণ, মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি ও বনায়নের ক্ষেত্রে উচ্চভূমি থেকে শুরু করে উপত্যকা অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে হবে। জল মাটি সংরক্ষণের প্রদান উপায় হল গাড্ডা খনন নতুবা বাধনের বাধা তৈরি। একশ দিনের কর্মসূচিতেই মূলত এই কাঠামোগুলি তৈরি করা হবে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মূল কথাও জল-জমি জঙ্গালের উন্নয়ন। সমগ্র প্রকল্প এলাকার ওপর বারিপাতের অন্তত এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করলে পারলে এলাকায় তিনবার ফসল ফলানোর জলের যোগান নিশ্চিত করা যাবে। এই হিসাবকে বলে 'জলের জমা খরচ খতিয়ান বা ওয়াটার বাজেটিং'। ক্ষুদ্র জলবিভাজিকার বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করা দরকার যাতে এলাকার প্রস্তাবিত বিভিন্ন ভূমি সংরক্ষণ কাঠামো অন্তত এমন এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টির জল রাখবে। এই ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা

ভিত্তিক পরিকল্পনার বৃহদাংশ 'একশ দিনে'র প্রকল্পে রূপায়িত হবে, যেগুলি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে রূপায়ণ সম্ভব। বাকি অংশটি অন্যান্য দপ্তর ও প্রকল্পের দ্বারা রূপায়িত হবে মূলত 'জেলা সমন্বয় পরিকল্পনা'র অংশ হিসেবে। যেহেতু কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের রূপায়ণের একক গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত ক্ষুদ্র জলবিভাজিকাগুলির কর্মপ্রস্তাবুগিল গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সুসংবদ্ধ করতে হবে। এই কর্মসুচী রূপায়ণে বনদপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, কৃষিদপ্তর, জলসম্পদ দপ্তর, সেচ দপ্তর, এমনকী মৎস্য, প্রাণীসম্পদ দপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বনদপ্তরের সাহায্যে বনভূমির মধ্যেকার নিবিড় পরিকল্পনা রচনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

রূপায়ণ পর্ব: নতুন বছরে জল মটি জঙ্গাল সংরক্ষণের ও সৃষ্টি কাজ শুরু হবে জলবিভাজিকা ধারণা মতে। উচ্চভূমি থেকে অববাহিকার দিকে কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিকল্পনা রচনার সময় যে যে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল তার সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চ এলাকার ক্ষয়িত, অনাবাদী জমি, পতিত বনভূমি উদ্ধারে গৃহীত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষয় রোধের ব্যবস্থাগুলির রূপায়ণ হল জলবিভাজিকা উন্নয়নের প্রথম কাজ । অনাবৃত উচ্চভূমর ঝড়বৃষ্টির অভিঘাতে সৃষ্ট ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়রেখা, ক্রমে যা ক্ষয়িত খাদে ও পরবর্তীতে নালায় পরিণত হয়। এগুলি পাথরের প্লগিং, উদ্ভিজ্জ বাধা, বোল্ডার চেক, গ্যাবিয়ন ইত্যাদি কাঠামো দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। টাঁড় জমিতে পাতার আচ্ছাদন বাড়িয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে উর্বরতা ফিরিতে আনতে বনসৃজনে হাত দিতে হবে। ইতিমধ্যেই আরব দেশের খেজুড় বসিয়ে সাফল্য পাওয়া গেছে। এমন খরা সহিষ্ণু অর্থকরী গাছের প্রসার বাড়াতে হবে। সমস্ত ধরনের বনসৃজনের জায়গায় অবশ্যই ভূমি-সংরক্ষণের কাঠামো, যেমন ৩০-৪০ মডেল, ভি-ট্রেঞ্চ, বিচ্ছিন্ন সমোন্নতি নালা বা বাঁধ তৈরি করতে হবে। উচ্চ এলাকার বাঁধনহীন জমিখণ্ডে আইল বাঁধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকায় জলশোষক গাড্ডা, জলভরণ পুকুর, ঢালের প্রকৃতি অনুসারে সমোন্নতি বাঁধন বা নালা (বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্ন),

উদ্ভিজ্জ বাঁধনের সারি অধিক পরিমাণে করা দরকার। একটু নিম্নভূমিতে জোড়বাঁধ তৈরি করেও জল সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে ঠিক নীচের দিকের জমিগুলিতে কাজ শুরু করতে হবে অধিক সংখ্যক হাপা, ৫% মডেল গড়ে তুলতে হবে। উপত্যকার জমিগুলিতে জলক্ষরণের সুযোগ নিয়ে নালায় চেকবাঁধা, ক্ষেতে সেচপুকুর, কুয়ো তৈরি করা সম্ভব। এতে যেমন অনিয়মিত ও বিরতিযুক্ত বৃষ্টিপাত জনিত শস্যবিপর্যয় আটকানো সম্ভব, জরুরি সেচ নিশ্চিত করে। তাছাচড়া একটি রবি ফসলের সেচও সম্ভব। এই সেচ পুকুর থেকে। একই রকম কাজে আসে চেকড্যামের জল। জলবিভাজিকা অঞ্চলের মুখ্য নালাপথের সংস্কারের পাশাপাশি দুই পাড়ে ভেটিভার ঘাসের বাঁধন দিলে তা ভাঙন রোধ, সীমানা চিহ্নিতকরণ ও দুই পাশের জমির পলির আগ্রাসন নদীকে থেকে রক্ষা করতে পারবে। বনসৃজনের ক্ষেত্রে বৃক্ষপাট্টা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জল, জমি ও জঙ্গাল ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নে জোর দিতে হবে। অন্তত ১৩ ধরনের বিষয় ভিত্তিক বনের কথা বলা হয়েছে, যা একলপ্তে করা প্রয়োজন, যাতে সংশ্লিষ্ট বনটির উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন সম্ভব হয়। পশ্চিমাঞ্চলে একসময়কার বিখ্যাত ওষধি গাছ, মশলার গাছ, ফলের গাছের রোপণে জোর দিতে হবে। প্রয়োজন ভিত্তিক জ্বালানি ও আসবাব কাঠের বন, পশুখাদ্য বন, ফুল বন, পুষ্টি বন তৈরি করতে হবে।

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে জৈব ও কেঁচো সার, এ্যাজোলা সারের প্রসার ঘটিয়ে এই এলাকায় মাটির উর্বরাশক্তি ও পশুখাদ্যের যোগান বাড়াতে হবে। এতে যেমন গৃহপালিত পশু-পাখির সংখ্যা বাড়বে, তেমনি জলসঞ্চয় বৃদ্ধির কারণে মাছ চাষের প্রসারও ঘটবে। ইতিমধ্যেই পরিবার ভিত্তিক মাগুর চাষের প্রচলন বেড়েছে। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে চারা ঘর তৈরি করে জীবিকা উন্নয়নের কাজ জোরদার করতে হবে। অকার্যকর ভূমিকে ফসলের উপযোগী করে তুলতে প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে হবে। জলবিভাজিকা উন্নয়ন এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থসামাজিক সমীক্ষার নিরিখে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি উপভোক্তা

প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। মাছ পুকুর, সেচ পুকুর, উদ্যান পালন, চারাঘর, কেঁচোসার, পশু ও পখি পালনের মতো একাধিক বিষয়ে এদের সাহায্য করতে হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই কাজ শুরু করে ২০২১-২২ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

প্রভাবের পরিমাপ: এই প্রকল্পের লক্ষ্যগুলি হল এলাকায় সামগ্রিক জলসঞ্চয় বাড়ানো, সেচের সুযোগ বৃদ্ধি, শস্য নিবিড়তা ও রোপিত এলাকার সম্পসারণ, শস্য বৈচিত্র্য জনগ্রাহ্য করা, অনাবাদী ও উষর ভূমি বনাচ্ছাদিত করা, পশু-পাখি পালনের বহর বৃদ্ধি, পশুখাদ্যের যোগান বৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, নদী-নালায় সারা বছরের সুস্থিত প্রবাহ বৃদ্ধি, মাটির ক্ষয় রোধ। প্রকল্প সময়সীমার মধ্যে এমনতর সূচকগুলি নির্দিষ্ট সময়ান্তর পরিমাপ করে, যথাযত ভাবে গ্রন্থিত করে পরিবর্তনের তীব্রতা বোঝা দরকার। ধারা সেবকরা এই সূচকগুলি নিয়মিত পরিমাপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন।

শেষ কথা: ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা হল উচ্চ অববাহিকা ঘেরা এক জলভরণ এলাকার যার জল উপত্যকা চিরে যাওয়া একটি সাধারণ নালাপথের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। নদী উপত্যকা, এই ক্ষুদ্র জলচিত্রের বহুব্যাপ্ত দ্যোতনা পশ্চিমের পাঁচ জেলা চিরে বহমান সাতনদীর জলপূর্তির পরিসর ছড়িয়ে আছে ৫৫টি ব্লকের ৪৭২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৭৯১.৯২ বর্গকিমি পরিমিত স্থানের সমস্ত ক্ষেতে, প্রান্তরে। এমন ভাবেই জল-নাড়ীর যোগ তৈরি হয় প্রত্যেক ক্ষেতের সঙ্গে সাগরের। মোট বারিপাতের একের তিন ভাগ যদি সাগর যাত্রা না করে সঞ্চিত থাকে ধাত্রী মায়ের আঁচলে, তবে বহু ফসলি ও উর্বরা হয়ে সবুজে ভরে উঠবে সব নব্য 'সেচ সেবিত' ক্ষেত, পূর্ণ হবে সব সেচকূপ, প্রাণী মুখরিত হবে অক্ষেত প্রান্তর। সম্বৎসর 'স্রোতসিনী' হবে সপ্তনদ অজয়, ময়ূরাক্ষী, কাঁসাই, শিলাই, দ্বারকেশ্বর, দামোদর, সুবর্ণরেখা। শেষ হবে পাঁচ দশকের চাতক পাখির 'জল খোঁজা'র পালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়

সুদীপ্ত পোড়েল, উপসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাংলা চিরন্তন ফুলের দেশ। ফলের দেশ। মশলার দেশ। এর টানেই অনাদি কাল থেকে বিদেশ বিভুঁই হয়ে নৌকা-জাহাজ উজিয়ে বাংলায় হাজির হয়েছিল কত শত বণিকের দল। জাহাজ বোঝাই হয়ে ফেরত যেত মশলা -ফল। বালার অর্থনীতি শক্ত বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়েছিল। দিন গেছে। বদলেছে সমীকরণ। ফল্ল ফলে না তেমন। ফললেও বাণিজ্যিক নয়। এই ফুল ও ফলের বর্তমান চালচিত্র ও মানচিত্র, আগামী সম্ভাবনার রেখাচিত্র পর্যালোচনা করলেই সামগ্রিক অবস্থান অনুধাবন করা যাবে।

সারা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-জলবায়ু অঞ্চল অনুসারে ছটি অঞ্চলে বিভাজিত। (১) উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল (২) পুরাতন গঙ্গা বিধৌত গাঙ্গোয় সমভূমি (৩) নতুন গঙ্গা বিধৌত গাঙ্গোয় সমভূমি (৪) তরাই তিস্তা অঞ্চল (৫) তরঙ্গায়িত লাল-ল্যাটেরাইট অঞ্চল (৬) উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল। মাটি ও জলবায়ু অনুসারে গাছের রকম ফের আছে। এলাকাগত সম্ভাবনার কথা মাথার রেখে, বিপণনের রাস্তা খুঁজে নিয়ে এইসব ফল-ফুল ও অন্যান্য অর্থকরী গাছের প্রসার ঘটাতে পারলে বাংলার অর্থনীতিতে এর প্রভাব হবে অপরিসীম। বাগান তৈরির প্রাথমিক খরচ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে করা সম্ভব।

উত্তরের পার্বত্যভূমিতে কমলা-কিউই-র মতো ফল, অর্কিডের চাষ দারিদ্র দূরীকরণে নতুন দিশা আনবে। উল্লেখ্য ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় এবং ১৫০০ সালে পোর্তুগিজ বণিকদের দ্বারা ইন্দোচীন পার্বত্যভূমি থেকে কমলালেবুর প্রসার ঘটে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ১০-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা. ও বার্ষিক ১০০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত কমলাচাষের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তম নিকাশী, হালকা-দোঁয়াশ ৬-৮ অম্ল-ক্ষারের মাত্রাযুক্ত মাটিতে এর ভালো ফলন সম্ভব। পার্বত্য জমিতে সব খরচ বাদ দিয়েও প্রথম বছরে একরে ২০,০০০ টাকা ও পরবর্তীকালে অনূন ৩০,০০০ টাকা লাভ হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে কমলা বিপ্লব এখানকার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনবেই। কমলালেবু চাষের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলিম্পং

ও কার্শিয়াং এর আঞ্চলিক গবেষণাগার চারা ও কারিগরি সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে।

বর্তমানে 'সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ওষধি অধিকরণ' অরুণাচল প্রদেশ থেকে কিউই ফলের চারা এনে বাংলায় এই ফলের প্রার ঘটাচ্ছে। কিউই ২,০০০-৬,৫০০ ফুট উঁচুতে ৪.৪-২৫* সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে। ১৯২৪ সালে নিউজিল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে এই চাষ শুরু হয়েছিল। এই চাষে চতুর্থ বছরে যেকানে এক একর জমিতে ৫ টন উৎপাদন হয়, সপ্তম বছরে তা দাঁড়াবে ৮ টনে। টন প্রতি ১৮, ০০০ টাকা দাম ধরে বছরে ১.৫ লাখ টাকার মতো রোজগার হওয়া সম্ভব। দার্জিলিংয়ের অর্থনীতিতে এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অন্যতম আরেক গুরুত্বপূর্ণ ফল হল আনারস। কথিত আছে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজরা দক্ষিণ ভারতে আনারসের প্রচলন করেন। প্রথম দশ আনারস উৎপাদক দেশের মধ্যে ভারত একটি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার উচ্চতায় ১০০০-১৫০০ মিমি বৃষ্টিপাত এলাকায় উজ্জ্বল' সূর্যালোকে এর ফলন ভালো হয়। ৪.৫-৫.৬ অম্ল-ক্ষার মাত্রা যুক্ত বালি দোঁয়াশ মাটিতে এর ফলন ভলো হয়। পশ্চিম বাংলা আনারস উৎপাদনে ভারতের মধ্যে প্রথম। উত্তরবঙ্গের ১১,৫০০ হেক্টর জমিতে মোট উৎপাদন হয় ২৫ হাজার মেট্রিক টন। চার বছর পর্যন্ত এই গাছ থেকে ফলন পাওয়া যায়। ১০০ দিনের প্রকল্পে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে এককালীন ব্যক্তি উপভোক্ত প্রকল্পে আনতে পারলে এই চাষের প্রসার ও এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করা সম্ভব। উদ্যানপালন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে।

মালদা-মুর্শিদাবাদের আমের খ্যাতি জগৎজোড়া। মালদার আম গবেষণা কেন্দ্রের সহায়তায় এই ফলের নতুন নতুন প্রজাতির চল ঘটছে। ইতিমধ্যেই মালদা-মুর্শিদাবাদের পরিসর ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলাগুলিতে আম চাষের প্রসার ঘটেছে মুলত কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কল্যাণে। বাঁকুড়া আম রপ্তানিকারক জেলায় পরিণত হতে চলেছে মূলত

এই প্রকল্পের হাত ধরে, আর স্বনির্ভর দলের শ্রমে লিজে নেওয়া বিস্তৃত পতিত জমি ফলের বাগানে পরিণত হওয়ার ফলে। আম্রপালি, মল্লিকার পাশাপাশি আলফান্সো চাষের প্রসার ঘটেছে এই সব জেলায়। উল্লেখ্য আলফান্সো আম বিদেশে খুবই সমাদৃত। এক একরে সঠিক পর্যায় ৫-৭ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে। শুধু আম থেকেই বছরে একর প্রতি বছরে ২৫৫০০ টাকা আসতে পারে। সাথী বা অর্ন্তবর্তী ফসলের চাষে এই লাভ আরো বাড়বে.

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এবং তিস্তা-তরাই জলবায়ু অঞ্চলে রাবার চাষের বিপুল সম্ভাবনা আছে। এই অঞ্চলে জলবায়ুগত উপযুক্ততা এবং উৎপাদনের হার ভারতের গড়ের চেয়ে বেশি। তাই এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে এই জেলাগুলিতে উদোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯০২ সালে ভারতে রাবার চাষ বাণিজ্যিকভাবে শুরু হলেও বাংলায় এখনও এর বাণিজ্যিক উৎপাদন প্রত্যাশিত মানে পৌঁছায়নি। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে রাবার চাষ থেকে হেক্টরে বছর ভর ১৭৫৬ কেজি রাবার পাওয়া যাবে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রথম কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে রাবার বন তৈরি করে। অন্যান্য জেলাতেও এই কাজ শুরু হয়েছে। সিঙ্কোনা অধিকরণ ও রাবার বোর্ড এই প্রকল্পে কারিগরি সাহায্য, চারা তৈরি, বিপণনে সাহায্য করছে। রাবার উৎপাদনে ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বে রাবারের চাহিদা যা দাঁড়াবে তাতে ৪৩-৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে উৎপাদন প্রয়োজন আছে। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এর প্রসার ঘটাতে পারলে উপভোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

উত্তরবঙ্গের আর একটি অর্থকরী ফসল হল আনারস। ১৫৪০ সালে পোর্তুগিজরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দক্ষিণ ভারতে এই গাছের বিস্তার ঘটায়। যেহেতু উত্তরবঙ্গে বাণিজ্যিক ভাবে এর জনগ্রাহ্যতা প্রশ্নাতীত, ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে এবং উদ্যানপালন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে এর প্রসার ঘটান হচ্ছে। মে-আগস্ট মাসে একর প্রতি আনারসের উৎপাদন আসে ৭-১২ টন।

উত্তরবঙ্গে শিল্পবনের আঙ্গিকে বেত-বাঁশের বন ও প্রাসঙ্গিক শিল্পসামগ্রী তৈরির বিপুল সম্ভাবনা আছে। আলিপুরদুয়ারে বেতের চাষ ও সব জেলায় বাঁশের চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ'-এর মতো বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও তাদের সাথী সংস্থা চট্টগ্রাম-স্থিত 'বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান'-এর সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। একরে ১০-১৫ টন বাঁশ উৎপাদন সম্ভব। একটি বাঁশের ভর ১০ কেজির মতো। আলিপুরদুয়ারে বেতের তৈরি আসবাব আন্তর্জাতিক গুনমানের। বন দপ্তরের সাহায্য নিয়ে এর আরও বিস্তার প্রয়োজন। এছাড়া আলিপুরদুয়ারে বহুমূল্য আগর গাছের সূচনা করা হয়েছে। জলপাইগুড়িতেও ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে আগর বন তৈরি করা হবে। সারা বিশ্বে আগর-আতরের বার্ষিক বাজার হল ১৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কেজি প্রতি আগরের দাম ৫-১০,০০০ ডলার। এক কেজি কালো কাঠের মূল্য ২ লক্ষ টাকা। পূর্ণ বয়স্ক (১৫-১৬ বছরেই উৎপাদন পাওয়া সম্ভব) আগর গাছের দাম ৫-১৫ লক্ষ টাকা। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এই লাভজনক চাষ অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নেবে।

উত্তরবঙ্গে চা-কফির সম্ভাবনার কথা বহুচর্চিত। জলপাইগুড়িতে, ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে ছোটো ছোটো চা বাগান তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে এক শ্রেণির মানুষকে দারিদ্রসীমার ওপরে আনা সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে কফি চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চা চাষের ক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু দরকার। অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি কফি উৎপাদন ৪০০-৭০০ কেজি হতে পারে। উত্তর বঙ্গের পার্বত্য ও তিস্তা-তরাই অঞ্চলে এই চাষের পাশাপাশি পশ্চিমাঞ্চলের ল্যাটেরাইট সম্পৃক্ত সাতটি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে চা চাষকরে সাফল্য পাওয়া গেছে। আই.আই.টি. খড়্গপুর এবং একো-ইয়েস সংস্থা এই প্রয়াসে কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১০০ দিনের কাজে তেজপাতা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, সুপারি, এলাচ সহ বিভিন্ন মশলার চাষ

বাড়ছে। দেশি ও বিদেশি বাজারের নিরিখে এই মশলা অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিত। আলিপুরদুয়ারে রাজ্য ওষধি পর্ষদের সহযোগিতায় ওষধি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটানো সম্ভব হচ্ছে। সর্পগন্ধা, অশ্বগন্ধা, নিম, ইপিকাক, চিরতা, কালমেঘ, তুলসী, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, অর্জুন, অশোক, ছাতিম, এ্যালোভেরার মতো অর্থকরী গাছের বিস্তার ব্যক্তি ও সমষ্টি উপভোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। এমনকী পার্বত্য অঞ্চলে 'সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ওষধি' অধিকরণের উদ্যোগে ওষধি গাছের প্রসার ঘটেছে। তাছাড়া ব্লকগুলির স্থানিক উদ্যোগে অর্কিডের প্রসার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পকে জীবিকামুখী অনন্য প্রকল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নে রাঢ় এলাকা অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষত ফল চাষের প্রসারে, আম চাষের ক্ষেত্রে আম্রপালি, মল্লিকা, আলফান্সো সহ বিবিধ প্রজাতির উন্নত গুনমানের আম উৎপাদন করে মালদা-মুর্শিদাবাদের সমকক্ষ হতে পেরেছে। অবশ্যই একশ দিনের প্রকল্পের কল্যাণে। স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে অনুর্বর বিস্তীর্ণ লিজ-জমিতে এই চাষ বাঁকুড়া সহ অন্যান্য জেলায় অত্যন্ত সফল হয়ছে। এছাড়া শোলাপুরের বেদানা গবেষণা কেন্দ্রের চারা ও কারিগরি দক্ষতার সাহচর্যে বেদানা চাষের দ্রুত প্রসার ঘটছে রাঢ় জেলাগুলিতে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৯.১২ টন। একর প্রতি লাভ প্রথম বছরে ৩২,০০০ টাকা যা অষ্টম বছরে ৬৯,০০০ টাকায় দাঁড়াতে পারে। এছাড়া রাঢ় অঞ্চলে বাওকুল, মোশম্বি লেবু, কাগজিলেবু, সবেদা, পেয়ারা, তাল, আরব-খেজুর অর্থকরী ফসলহিসেবে স্থানীয় পুষ্টি মানচিত্র ও আর্থিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাবে।

রাজ্য ওষধি পর্ষদের সঙ্গো সমন্বয়ে বীরভূম ও বাঁকুড়ায় বড়ো ওষধি বাগান তৈরি করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। একসময় এই জেলাগুলি ওষধি গাছে পরিপূর্ণ ছিল। সময়ের সঙ্গো এর বিপণন, কদর ও অস্তিত্ব অর্ন্তহিত হয়েছে। কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে সেই হৃত গরিমা ফিরিয়ে আনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এর সঙ্গো কিছু কিছু মশলা চাষের

পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়। এই জেলাগুলিতে জৈব রংয়ের গাছের বিরাট সম্ভাবনা আছে। যেমন নীল, শিউলী, পলাশ প্রভৃতি। এ ব্যাপারে তন্তুজের মতো সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করা দরকার।

ফুল চাষের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু সফল উদ্যোগ ব্যাপকতর পরিসরে প্রয়োগ করার সময় এসেছে। বাঁকুড়ার জয়পুরে গোলাপ চাষ করে এবং পুরুলিয়ায় শহর-মন্দির সন্নিহিত অঞ্চলে জবার চাষ করে ব্যক্তি উপভোক্তার আর্থিক সংগতি বাড়ান গেছে। এমনকী ১০০ দিনের প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্যিকভাবে পদ্ম ও রজনীগন্ধা চাষের সুযোগ আছে। এক হেক্টর জমিতে ২-৩ হাজার গোলাপ জন্মে। সঠিক পরিচর্যায় একাধিক উৎপাদন চক্রে হেক্টরে লক্ষাধিক টাকার গোলাপ বিক্রয় সম্ভব। রজনীগন্ধা চাষের ক্ষেত্রে একটি চক্রে হেক্টরে ৮,০০০ কেজি ফুল পাওয়া সম্ভব। ফুল চাষের ক্ষেত্রে মন্দির শহর বা বড়ো শহরের সন্নিকটস্থ ব্লকগুলিকে নির্বাচন করা যেতে পারে।

তালগুড় মহাসমঙ্ঘ বছরে কোটি টাকার ব্যবসা করার ক্ষমতা থাকলেও ক্রমহ্রসমান তাল-খেজুর বন ও ৮০% বেশি গাছ বাণিজ্যিক ভাবে এখনও ব্যবহৃত না হওয়ায় এদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিশা অনেকটাই থমকে আছে। ব্যাপক হারে তালের বন তৈরি ও তার বাণিজ্যিক ব্যবহার এর সমস্যার নিরসনে সাহায্য করবে। আরবের খেজুর রাজনগর ব্লকে তৈরি হলেও ব্যাপক প্রসারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আট বছর পর থেকেই তালরে উৎপাদন শুরু হয় এবং পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ১৫০-২৫০ টি তাল পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত তালের ও তাল গাছের বিভিন্ন অংশের প্রায় ৮০০ রকমের ব্যবহার পাওয়া যায়। যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৫৫৩০-৫৩২০ বছর আগে আরবে খেজুর চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে এই আরব খেজুর গাছে বছরে ২০০ কেজি খেজুর উৎপাদন হয়। 'বারহী' প্রজাতির খেজুর গাছে বাৎসরিক ৫০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যায়। সুতরাং এমন চাষে বছরে গাছ থেকে

১০০০০-২০০০০ টাকা পাওয়া সম্ভব।

রাঢ়ের জেলাগুলিতে বেদানা চাষের চল শুরু হয়েছে বিগত ২০১৫-১৬ সাল থেকে। কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প এবং শোলাপুর বেদানা গবেষণা কেন্দ্রের কারিগরি সহায়তা, উন্নত চারা নিয়ে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বেশ কিছু বেদানা বাগানের উৎপাদন শুরু হয়েছে। পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হলে হেক্টর প্রতি ফলন দাঁড়াবে ১০ টন। সুতরাং ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পে বা সমষ্টি জমিতে এই ফলের চাষে পুষ্টি ও আর্থিক সংগতি দুই-এর বৃদ্ধি আনবে। সমস্ত রাঢ় এলাকা জুড়ে বেদানা চাষ জেলাগুলির অর্থনৈতিক মানচিত্রের আমূল বদল আনবে।

বিভিন্ন লেবুর বন যেমন মৌসম্বি, কাগজি, পাতি, বাতাবি এমনকী কমলালেবুর উৎপাদন রাঢ় অঞ্চলে আশাব্যঞ্জক। এছাড়া আপেলকুল, আতা, সবেদা ও পেয়ারার উৎপাদনও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে আশার আলো এনেছে। এমনকী বাঁকুড়া জেলা নতুন অর্থকরী ফসলের সন্ধানে আপেল, আঙুর-এরমতো ফলের প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। এমনকী ক্যাকটাস ও সাজানো বাগানের গাছের চারাঘর করে নতুন জীবিকা পথের সন্ধান মিলবে। এই অঞ্চল মূল্যবান ও পুষ্টিকর ড্রাগন ফলের পক্ষে উপযুক্ত এবং এর উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

গবাদি পশুর গুণগত মান বৃদ্ধি ও পশুখাদ্যের যোগান বৃদ্ধিতে চারণভূমি উন্নয়ন হাতে নেওয়া দরকার। সাবাই, বাবাই, ভেটিভার, কোফাইভ, সুবাবুল সহ বিভিন্ন গোখাদ্যের চাষ অত্যন্ত জরুরি। পতিত জমিতে, খালপাড়ে, এমনকী নয়নজুলিতে এর প্রসার ঘটান যেতে পারে। বর্তমান গোখাদ্য সংকট থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একমাত্র পথ।

ফলের পাশাপাশি মশলার চাষ, ওষধি গাছের প্রসার অত্যন্ত জরুরি। রাঢ়ের জলবায়ু ও মাটি এগুলির পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া এই পশ্চিমাঞ্চলে সবজি ও পুষ্টি বাগান অপুষ্টির তীব্রতা থেকে জেলাগুলিকে মুক্ত করছে। প্রতিটি অপুষ্ট শিশুর পরিবার পুষ্টি বাগান তৈরি করা হচ্ছে। কলা, সজনে (মোরিঙ্গা), পেঁপে, পাতি লেবু, তেঁতুল, ডুমুর, জলপাই, নিম, আমড়া,

বকফুল, কাঁঠাল, এঁচোড়, চালতা, কারিপাতা-র মতো গাছগুলিকে পুষ্টি বাগানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিশুবিকাশ কেন্দ্র সংলগ্ন বাগানেও এই পুষ্টি গাছ বসান দরকার।

এমনকী করঞ্জ, মহুয়া, ভেরেন্ডার মতো গাছের তেলবন তৈরি করাও সম্ভব এই পশ্চিমাঞ্চলের জমিতে। শাল, সেগুন, গামার, মেহগনি, শিশু, বাবলার মতো আসবাব কাঠের রোপণ এলাকার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষ উপযুক্ত। ৩০-৪০ বছরে হেক্টরে ৯৪ ঘনমিটার কাঠ উৎপাদন সম্ভব। ঘনমিটার কাঠের দাম ১৫,০০০-৩০,০০০ টাকা। ১০ বছরের শিশু কাঠের পরিমাণ হেক্টরে ১০ ঘনমিটার যা ৬০ বছরে ৪০ ঘনমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

বন ও ফলের ক্ষেত্রে যেহেতু ৪-৫ বছর অন্তত ফলের অপেক্ষায় থাকতে হয়, এই সময়ে অন্তবর্তী ফসল হিসেবে ডাল শস্য, সবজি চাষ করতে পারলে তাদের আর্থিক অবস্থান সদৃঢ় করা যায়।

পশ্চিমাঞ্চলে চা-কফি ছাড়া তসর-রেশম প্রসারে উপযুক্ত গাছের (অর্জুন, আসান, কুল ইত্যাদি) বিস্তার এই শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলেছে। বাঁশ গাছের বিস্তার বাঁশ ভিত্তিক শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করছে। একশ দিনের প্রকল্পে এই সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে হবে।

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ফল বন ছাড়াও শিল্প বন, পুষ্টি বন, মশলা বন, ঘাস বন, ওষধি বন এবং ক্যাকটাস-সাজান গাছের উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে। এই জেলাগুলিতে জৈব রংয়ের গাছের বিরাট সম্ভাবনা আছে। যেমন নীল, শিউলি প্রভৃতি। তন্তুজের মতো সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করা দরকার।

গঙ্গা বিধৌত সমভূমি অঞ্চলে ফলের গাছের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা চিরকালীন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তা অবহেলিত রয়ে গেছে। আম,জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, লেবু, নারকেল, সবেদা, কলার মতো ফলের উপযুক্ততা সর্বাধিক হলেও কিছু স্থানিক প্রচেষ্টা ছাড়া বাণিজ্যিক উৎপাদন প্রায় নেই। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে এই ক্ষেতের সম্প্রসারণের বড়ো সুযোগ আছে।

অন্যান্য জেলা ছাড়াও এই সমতলের জেলাগুলিতে নদী ভাঙ্গানের সমস্যা থেকে বাঁচাতে কম খরচের ভেটিভার ঘাসের চল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। এই ঘাস থেকে বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী, শৌখিন, জিনিস, ধুপ ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি শুরু করেছে দুর্বলতর পরিবার ও স্বনির্ভর দল। রাজ্য জুড়ে তৈরি হওয়া কয়েকশ কিমি লম্বা ঘাসের সারি এর কাঁচা মাল সরবরাহ করবে। নিখরচায়। এই ঘাসের প্রসারের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রাম ট্রাস্ট সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া এই জেলাগুলিতে ফুল, মশলা, শৌখিন গাছ, আসবারের বনেরও বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া হাওড়ার মতো জেলায় ইতিমধ্যেই কয়েক হেক্টর জমিতে গোলাপ, জবা, পদ্মের চাষ ১০০ দিনের প্রকল্পকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলছে।

উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে নারকেল উন্নয়ন পর্ষদের সহযোগিতায় বিগত দুই অর্থবর্ষে লক্ষাধিক নারকেল গাছ বসান হয়েছে। উপকূলীয় অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব তৈরি হবে। নারকেলের বিভিন্ন সামগ্রী, ছোবড়া ভিত্তিক শয্যাসামগ্রী নির্মাণ শিল্পের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এছাড়া ম্যানগ্রোভ জঙ্গল প্রসারে অর্থকরী গাছের ভাবনায় গঞ্জাম জেলা থেকে তেল উৎপাদনকারী কেওড়া গাছ এনে বসান হয়েছে। এর ফুল থেকে অতি মুল্যবান সুগন্ধী তেল তৈরি হয়। এই শিল্পের প্রসারে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কাজু, জলপাই, ড্রাগন ফল, লেবু, কুল, পেয়ারা, সবেদা, আতার মতো ফল এই এলাকায় বেশি পরিমাণে ফলান সম্ভব।

রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে বিভিন্ন নির্দেশের মাধ্যমে বনসৃজনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি জোর দিয়েছে।

(১) ঘাসবন, গুল্ম ও ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্প ছানা সমস্ত প্রকার বনসৃজনে বৃক্ষপাট্টার মাধ্যমে দুর্বলতর পরিবারগুলিকে গাছের ওপর অধিকার সহ দেখ ভালের দায়িত্ব দিতে হবে। দেখ-ভালের জন্য গাছ পিছু মাসিক মজুরি দিতে হবে, গাছ বাঁচানোর শর্তে। সরকারি জমিতে বৃক্ষপাট্টায় গাছের ফুল-ফলের মতো উৎপাদনের ওপর পাট্টাদারের ৭৫% ভাগ অধিকার থাকবে এবং কাঠের ওপর থাকবে একই ভাগ।

লিজ জমির ক্ষেত্রে ফলের অধিকার ত্রিপাক্ষিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে উপভোক্তা পাবে ৬৫%, জমি মালিক পাবে ২৫% ও পঞ্চায়েত ১০%। কাঠের ক্ষেত্রে ৫০% উপভোক্তা, জমি মালিক ৪০%, পঞ্চায়েত ১০%পাবে। পথপার্শ্বে গাছর ক্ষেত্রে ৯০% বেশি গাছ বেঁচে থাকলে গাছ প্রতি ১০ টাকা মাসে পাবে (একটি পরিবার ৫০-১০০ গাছ পেতে পারে), ব্লক জমিতে গাছের ক্ষেত্রে গাছ প্রতি ৫ টাকা প্রতি মাসে। পরিচর্যার অভাবে ঘটলে এর হার অর্ধেক হয়ে যাবে। গাছের ধরনের ওপর দেখ ভালের মজুরি দেওয়া যাবে ৩-৫ বছর।

(২) বিষয়ভিত্তিক বনসৃজন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের বনগুলি হল (ক) ফল বন (খ) ওষধি বাগান (গ) সবজি বন (ঘ) মশলা বন (ঙ) কাঠের বন (চ) তেলের বন (ছ) শিল্প বন (জ) ফুল বন (ঝ) রং বন (ঞ) সুগন্ধী উৎপাদক বন (ট) জ্বালানী বন (ঠ) ঘাস ও গোচারণ বন (ড) শৌখিন গাছের চারাঘর ও বন (ঢ) উদ্ভিজ্জ, বেড়ার চারাঘর ও বন। (ণ) ক্যাকটাসের চারাঘর ও বন (ত) অর্কিডের চারাঘর ও বন।

(৩) চারা বাইরে থেকে না কিনে নিজেরা চারাঘর তৈরি করে উৎপাদন করবে। এজন্য যথেষ্ট সংখ্যক গ্রীন হাউস তৈরি করতে হবে। জোগান যথেষ্ট না হলে সরকারি সংস্থা থেকে উন্নত চারা কেনা যাবে। এর বাইরে চারা কিনতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

(৪) একই ভাবে সারের ব্যবহার নিজস্ব সারগাদা থেকে করতে হবে। বিশেষত পাট্টাদার বা স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে। সরকারি সাহায্যে গড়ে ওঠা এই সার উৎস থেকে, সমষ্টি থেকে ঠিক কার দরে সার কিনতে হবে। বিভিন্ন তৈরি বনের সঙ্গো জৈব সার তৈরির কাঠমোর অনুমোদন দিলে একাজ তরান্বিত হবে। সারের উৎস যথেষ্ট না হলে তবেই অন্য সরকারি উৎস থেকে সার কেনা যাবে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার এড়াতে হবে।

(৫) বনসৃজন ও ফলবনের ক্ষেত্রে এক একটি ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এক একটি বিষয়ভিত্তিক বনসৃজনে জোর দিতে হবে, যাতে

পাইকারের ও বিপণনের সুবিধা হয় ও উৎপাদক যথাযথ দাম পান। এজন্য জেলা প্রশাসনের তরফে 'থেমাটিক ম্যাপিং' অত্যন্ত জরুরি। জেলাস্তরে 'সুফল বাংলার' বিপণি ও বিপণন উদ্যোগের সঙ্গে এই উৎপাদনগুলি সংযুক্ত করতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ে চারাঘর তৈরি ও বনসৃজনের বিভিন্ন ধাপ মেনে চলা দরকার। গাছের মৃত্যুহার বৃদ্ধির বড়ো কারণ অসময়ে গাছ বসান ও ছোটো চারা রোপণ। বর্তমানে দুই বছরের চারা তৈরির প্রচলন প্রচারিত হয়েছে।

বনসৃজনের নিম্নবর্নিত সূচি মেনে চলা দরকার: (১) আগস্ট: উপভোক্তা নির্বাচন (২) সেপ্টেম্বর: নার্সারির জায়গাটি পুরোপুরি প্রস্তুত করা (৩) অক্টোবর: পলিব্যাগ পূরণ শুরু করা (৪) নভেম্বর: অঙ্কুরিত চারা পলিব্যাগে রোপণ (৫ ডিসেম্বর-জানুয়ারি: চারা বেডগুলির পরিচর্যা (৬) ফেব্রুয়ারি: পলিব্যাগগুলি স্থানান্তর কার (৭) মার্চ: চারার পরিচর্যা (৮) এপ্রিল: পলিব্যাগ স্থানান্তর ও অতিরিক্ত মূলের ছেদন (৯) মে: পরিচর্যা (১০) জুন: স্থানান্তর ও অতিরিক্ত মূলের ছেদন (১১) জুলাই মাসে চারা রোপণস্থলে বয়ে নিয়ে যাওয়া। এই একই ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত পরিচর্যা করে চারা রোপণ রলে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করা আরো সহজ হয় এবং সে পদ্ধতিই অনুসরণ করা দরকার।

বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত সময়সীমা মেনে চলা দরকার (১) জানুয়ারি: রোপণের স্থান চিহ্নিত করে পরিষ্কার করা হয় (২) ফেব্রুয়ারি: সমস্ত পিট কেটে ফেলা হয় (৩) মার্চ: পিটে কীটনাশক প্রয়োগ, বেড়ার কাজ সম্পন্ন করা (৪) এপ্রিল: পরিমাণমতো গোবর সার সংগ্রহ করা (৫) মে:পিটগুলি পরিমাণমতো গোবর ইত্যাদি সার দিয়ে পূর্ণ করা, প্রয়োজনীয় কাজ সম্পর্কে মজুর ও উপভোক্তাদের বুঝিয়ে দেওয়া (৬) জুন-জুলাই: চাররোপণ, জলসেচ, আগাছা পরিষ্কার (৭) আগস্ট: অবশিষ্ট/মৃত গাছের বদলে নতুন রোপণ ইত্যাদি। (৮) সেপ্টেম্বর থেকে চলবে স্বাভাবিক পরিচর্যার কাজ।

(৭) রাস্তাধারের বনসৃজনে নিয়মিত জল দেওয়া দরকার। জলবহনের খরচ প্রাককল্যাণে ধরা যাবে। স্থানীয় ভাবে ভ্যান ওতার উপরিস্থ ট্যাপ সম্বলিত জলাধারের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

(৮) মিশ্র ফল বনে গুরুত্ব দিতে হবে। এমনকী থেমাটিক ম্যাপিং-এর ক্ষেত্রে ৭০% বিষয়ের গাছ ও বাকি অন্যান্য ফলের গাছ বসালে একটি ফলন কোনও প্রকারে ক্ষতি হলে সে বছর অন্য ফসল থেকে ফল পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফলন পেলে সারা বছরে সুস্থিত রোজগার নিশ্চিত হবে।

(৯) রাঢ় অঞ্চল সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফলবন ও অন্যান্য বন তৈরির সময় জমিতে ৩০-৪০ মডেল,- ট্রেঞ্চ, গাড্ডা তৈরি করে জল-মাটি সংরক্ষণের কাজ সুদৃঢ় করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বনায়ন বিবিধ বৈচিত্র ও সৃজন ভাবনার মাধ্যমে নতুন রূপ পেয়েছে। সম্ভব হয়েছে গাছ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের নতুন গতিমুখ খুলে দেওয়া। বছরে ১ কেটি বনসৃজন ও ১ লক্ষ পাট্টাদার তৈরির লক্ষমাত্রা অর্জন করার জায়গায় পৌছে যাচ্ছি। জীবিকা উন্নয়ন ও বনায়নের নতুন দিগন্ত খুলে।

জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচি: বাঁকুড়া-১ ব্লক

বাঁকুড়া-১ ব্লকের তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠ, লাল-কাঁকুড়ে মৃত্তিকাঞ্চলে অবস্থান, জলবায়ু, ক্ষয়িষ্ণু বনভূমি, জলমাটি সংরক্ষণের উপায় ও অবলম্বনগুলি অনুসরণের বিষয়ে কৃষিসমাজের অজ্ঞতা, ব্লকের কৃষি ও কৃষকের অবক্ষয়, অভিবাসন ও অনুন্নয়ন এর মূল কারণ।

উপক্রান্তীয় উপআর্দ্র জলবায়ু প্রভাবিত এই ব্লকের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২০০-১৪০০ মিমি যার ৭৫-৮৫ শতাংশই হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মধ্যে। বর্ষার আগমন ও প্রস্থান অনিয়মিত। দুটি বৃষ্টিস্নাত দিনের সংখ্যা ৯২-১০৩। একদিনে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ও দিনক্ষণের পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় অনিয়মিত বৃষ্টির ধরন, যেমন—২০০০ সালে ৫৪.২ মিমি (২৭ জুলাই), ২০০১ সালে ১১৬.৬ মিমি (৪ জুন), ২০০২ সালে ১২৪.২ মিমি (২৫ সেপ্টেম্বর), ২০০৩ সালে ৫৬ মিমি (১৪ জুলাই), ২০০৪ সালে ১৫০.৪ মিমি (১৩ আগস্ট), ২০০৫ সালে ৭৬.৬ মিমি (৩ আগস্ট)।

তরঙ্গায়িত ভূমি ও মাটির প্রকৃতি ভূমিক্ষয়কে দ্রুততর করে জলসংকট তীব্রতর করেছে। এই ব্লকের ভূপৃষ্ঠের ৫২ শতাংশই টাঁড়-বাইদ (উচ্চ ভূমি), ১৮ শতাংশ সোল-বহাল (নিম্নভূমি), ২০ শতাংশ কানালি (মধ্যভূমি)। এই উঁচু-নীচু বেলে ও বেলে-দোঁয়াশ মাটি ও মাটির নীচের স্তরবিন্যাসজনিত কারণে মাটির জল ধারণ প্রবণতা কম। গড়পড়তা স্তরবিন্যাস এরূপ—মাটি ০.৪ মি. চুন বা বালি মিশ্রিত শকত মাটি ১.৪ মি, ফেরাগেনাস কনেরেশান ০.১, ঘনীভূত নুড়িপাথর বোল্ডার ০.৪২ মি., তার নীচে ভিত্তি পাথর। ক্রমসংকুচিত বনভূমি ভূপৃষ্ঠকে বন্ধ্যাপতিত করে মাটির জলধারণ ক্ষমতাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে তোলে। ব্লকের মোট ১৮১৩০ হেক্টর এলাকার বনভূমি ১৯৪৪-৪৫

সালে ছিল ১৩৭৯.৪৫ হেক্টর বা ২০০৬-০৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১২৯৯ হেক্টর।

গাছের পাতার মূল শিরার মতো বাঁকুড়া-১ ব্লকের মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়ে গেছে ১৬.২ কিমি দ্বারকেশ্বর নদ। ব্লকের উচ্চ সীমান্ত দেশ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন জলনালাপথে ব্লক এলাকার বৃষ্টিজল ও ক্ষয়প্রবণ অঞ্চলের ক্ষয়িত মাটি এই নদীপথে এসে পড়ে। ব্লকের মূল জোড়গুলি হল: মাতলা জোড় (১০ কিমি), যমুনা জোড় (৮.৩ কিমি), আঙ্গারিয়া জোড় (৫.৮ কিমি), উজানি জোড় (৮ কিমি), পাঁচমি-ফুলবাগী-কুদ্রাসিনি জোড় (৩.৩ কিমি), মাঝকানালি ঝোড় (৫.১ কিমি), ভালুকসুন্ধা জোড় (৫.৪ কিমি), ছাগলকুটা জোড় (৩.৬ কিমি), দামড়াগোড় জোড় (২.৬ কিমি)।

এই নালাপথ ও তার জল যোগানকারী ভূমিভাগ ধরে সমগ্র বাঁকুড়া-১ ব্লককে ৩৮টি ক্ষুদ্র জলবিভাজিকায় বিভক্ত করা হয়েছে (এক একটির এলাকা ৩০০-১০০০ হেক্টর) এবং বিডি-১ থেকে বিডি-৩৮ নামে চিহ্নিত হয়েছে (বি অর্থে বাঁকুড়া, ডি অর্থে দ্বারকেশ্বর)। বিগত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ ও জল সংরক্ষণের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এই এলাকার আর্থ-সামাজিক চেহারা বদলাতে শুরু করেছে।

নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জলবিভাজিকা উন্নয়নের কাজ শুরু করে বিডি-৩ ও বিডি-৮ এ ২০০৩-০৪ অর্থবর্ষে। ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষে বিডি-৭, বিডি-৮, বিডি-৯, বিডি-৩২, বিডি-৩৩-এর কাজ শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা প্রকল্পে জলবিভাজিকা উন্নয়ন হচ্ছে বিডি-২, বিডি-৫, বিডি-৭, বিডি-১৪, বিডি-১৫, বিডি-১৭, বিডি-১৮, বিডি-২০ -এ। বিডি-১১ ও বিডি-১২ তে এন ডব্লু ডি পি আর-এ প্রকল্পে জলবিভাজিকা উন্নয়ন হচ্ছে।

বাঁকুড়া-১ ব্লকে ভূমির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ ফুট ওপরে। তরঙ্গায়িত ভূমির সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বিন্দুর মধ্যে তফাত ১০০-১৫০

ফুট। দীর্ঘদিনের ভূমি ও উর্বরতা ক্ষয়ে বর্তমান গড়পড়তা অবস্থান এ রকম-মাটির চরিত্র আম্লিক (পি এইচ ৫-৬.৫)। উর্বরতার নিরিখে নাইট্রোজেনর উপস্থিতি কম থেকে মাঝারি (২০০-২৫০ কেজি হেক্টর)। অন্যান্য খনিজের উপস্থিতি নগণ্য। গ্রীষ্মকালীন ভূগর্ভস্থ জলস্তরে অবস্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২-৩৫ ফুট নীচে। ওপরের মাটির স্তর ০-০.১৪ মিটার।

এই প্রেক্ষাপটে বাঁকুড়া-১ ব্লকে জলবিভাজিকা উন্নয়নের মাধ্যমে জলস্তর বৃদ্ধি করে ও ভূমিক্ষয় রোধ করে মাটির উর্বরতার কাজ শুরু হয় ১৯৯৬-৯৭ সালে। প্রথমে শুরু হয় পতিত জমি উন্নয়নের কাজ।

উচ্চভূমির পতিত জমিগুলিতে জলভরণ বাড়ানোর জল জমির চরিত্র মোতাবেক সামাজিক বনসৃজণ ও ফলের বাগান করা হয়েছে। ৩০-৪০ মডেল করার ফলে জলভরণ ও গাছের বৃদ্ধি ছিল উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো জায়গায় কন্টুর ট্রেঞ্চ ও ভি-টেঞ্চও করা হয়েছে। জলবিভাজিকা অঞ্চলগুলিতে শুধুমাত্র ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষেই শিশু, অর্জুন, গামার, সোনাঝুরি প্রভৃতি গাছ ৩৫২৫৮৬টি, আমলকি গাছ ২৩৬০০টি, জাট্রোফা ৪৮০০০টি, করঞ্জ ৫০০টি, বাঁশিন প্রজাতির বাঁশ ২১০০টি রোপণে এমন ৭৫০ একর পতিত জমিকে সবুজ বনে রূপান্তরিত করা গেছে। ১০২০০টি আম গাছ, ১৩৩০০ টি কাজুগাছ রোপণে ফলবাগান তৈরি হয়েছে ১২০ একর পতিত জমিতে। এই বনসৃজনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সৃষ্টি বনের ২০৫৮৮২টি বনগাছ ও ৫০০০টি ফলগাছ রোপিত হয়েছিল ৭৪টি স্বনির্ভর দলের দ্বারা ও তাদের মালিকানা স্বত্বে। এ রকম বনগুলির প্রিরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথ করা সম্ভব হয়েছে। পাথুরে টাঁড় জমিতে জাট্রোফা করঞ্জার মতো বায়োজিডেল গাছের চাষ করা হয়েছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থবর্ষে আরও ৭০০০০ করঞ্জা গাছ বসানো হয়েছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থবর্ষে বাইদ ও কানালি জমিতে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা ও জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বহু সংখ্যক হাপা (ফার্মপন্ড) কাটা হয়েছে। এর ফলে বাঁকুড়া-১ এ একফসলি জমিতে খরফি জরুরি সেচ ও খরিফ পরবর্তী সেচ করে

দুটি ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে বহু জমিতে। জলবিভাজিকা অঞ্চলগুলিতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ৯০টির মতো জলাশয়ের সংস্কার করে জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে সেচের সুযোগ বহুগুণিত করা হয়েছে।

২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা, জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও নাবার্ড পঞ্চায়েত যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্লকের জোড়গুলিতে ৪৯টি চেকড্যাম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই ড্যামগুলির সাহায্যে ৮০০ হেক্ট সোল জমিতে সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে যেখানে এখন ২-৩ বার ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ৬১টির মতো মাঠকুয়ো তৈরি হওয়াতে ক্ষুদ্রসেচের সুযোগ বেড়েছে। জলবিভাজিকা অঞ্চলের উপযোগী কম জলের ও কম সময়ের ফসল নির্বাচন সঠিক শস্য পর্যায় ও কৃষি প্রণালী গ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রগতিশীল কৃষকদের মাধ্যমে প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হয়েছে অনেক। নেকড়াগড়িয়ার বিজয় বাস্কে, কমলাগোড়ার সোমনাথ মুর্মু, ভালুকসুন্ধার কালুবরণ বাস্কে, কালপাথরের লালু মাল, মদন বাগদের মতো প্রগতিশীল চাষিদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ব্লকের বহু সংখ্যক চাষি এখন বন্দনার মতো ৯০ দিনের উচ্চভূমির খরসহনশীল ভুট্টা চাষ করছেন। বিগত ৫ বছরে সূর্যমুখী ও সরিষা চাষের ব্যাপক প্রসারের ফলে খরিফ-পরবর্তী সময়ে ব্লকের অধিকংশ জমিই হলুদ হয়ে ওঠে। জনপ্রিয় হয়েছে ওল-হলুদের চাষ। মিশ্র চা, ফালি চাষ ইত্যাদিও জনপ্রিয়াত লাভ করেছে। বিগত বছরগুলিতে সবজি চাষের ব্যাপকতা জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্যকে সূচিত করে। ব্লকে জলবিভাজিকা কর্মসূচির আরেক দিক হল, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, ও সুসংহত পোকা দমন কর্মসূচির রূপায়ণ। সবজি বাগান ও শস্যক্ষেত্রে কেঁচো সারের ব্যবহার বাড়াতে ২৭০টি স্বনির্ভর দল দ্বারা ছোটো কেঁচোসার সহ অন্য জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জমির হৃত উর্বরতা ফিরে আসছে। বিগত অর্ধদশকে জলস্তরের বৃদ্ধির ফলে ব্লকের পুকুরগুলিতে মাছ চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় মাছ চাষ

প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবুজায়ন পশুখাদ্যে প্রবণতা বিশেষত ভূমিহীন মানুষদের পশুপালনে উৎসাহী করছে। ব্লকে ২০০০-০১ সালে ছাগলে সংখ্যা ছিল ২১৭৩২। জলবিভাজিকা অঞ্চলগুলিতে জলবিভাজিকা কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ যার প্রজাতির প্রায় সবটাই ব্ল্যাক বেঙ্গল। একইভাবে হাঁস-মুরগি-গাভীর সংখ্যা বেড়েছে। জলবিভাজিকা উন্নয়নের সুফলেই অভিবাসন ব্যাপকতর অর্থে হ্রাস পেয়েছে। ধুলাডি, মুনিয়াড়ি, রাঙ্গামেট্যা, কাশিবেদ্যা, সেগুনসারা, শুনুকপাহাড়ি, বদরা, মেটাকোলা, পাপুরডিহির মতো অভিবাসন প্রবণ গ্রামগুলিতে এখন অভিবাসিতের সংখ্যা নগণ্য। এই ধরনের পরিবারগুলির জন্য ব্লকে ২৪৩টি ধান্য গোলা তৈরি করা হয়েছে ও এদেরকে মহাজনি বন্ধনমুক্ত করা গেছে। বাঁকুড়া-১ ব্লকের সারা বছরের বৃষ্টির জল থেকে প্রাপ্তি প্রায় ১৫ হেক্টর জমিতে মিটার জলরাশি অ(অর্থাৎ সব জল ধরে রাখতে পারলে ভূপৃষ্ঠে ৪.৫ ফুট জল সর্বত্র দাঁড়িয়ে থাকত)। জলবিভাজিকা কর্মসূচির গুলির সফল রূপায়ণে তার অনেকটাই ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। তার বড়ো প্রমাণ এই অঞ্চলগুলিতে শস্যনিবিড়তা বিগত ৫ বছরে ১১২ শতাংশ থেকে ১৮০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং সমস্ত গ্রামের জলস্তর ২০০৬-০৭ সালের খতিয়ানে দেখা যায় ২-১০ ফুট।

একথায় জলবিভাজিকা উন্নয়ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণ বাঁকুড়া-১ ব্লককে সবুজ ও সমৃদ্ধির নতুন পথে আনতে পেরেছে।

বিভিন্ন গ্রামে জলস্তর বৃদ্ধির খতিয়ান নিম্নরূপ:

মাস	শুনুক পাহাড়ি	রামাজিপুর	ছেন্দুয়া	চতুর ডিহি	নন্দীগ্রাম	ছেলে বাখরা	ধোবা গ্রাম	চেলেমা	মানুষ মুড়া	আগয়া
জানয়ারি	২৭	১৮	২৩	২৩	২৯	১৮	১৯	৩০	১২	১৯
ফেব্রুয়ারি ০৬	২২	১৫	১৯	২২	৩০	২০	২০	৩১	১৭	২০
মার্চ ০৬	২০	১২	১৭	২০	২৩	২২	২১	৩২	১৭	২০
মে ০৬	১৯.৫	১১	১৫.৭৫	১৭	২৬	২২	২৪	২৭	২০	২৩
জুন ০৬	২০.৫	১২	১৬.৭৫	১৮	২৩	২১	২৩	২৬.৫	১৭	২৪
জুলাই ০৬	২৪	১৪.৫	২০.৫	২০	২৫	১৪	১৭	১৮	৩	৪
অগস্ট-০৬	৩৫	২১.৫	৩০.৫	২৪	৩৩	১৮	১৯	১৯	৪	৪
সেপ্টেম্বর ০৬	৩০	১৯	২৭.৫	২৬	৩৪	১১	১৩	১৪	৪	৫
অক্টোবর ০৬	২৮	১৭	২৫.৫	২৪	৩৩	১০	১১	১৫	৬	৬
নভেম্বর ০৬	২৫	১৫	২২.৫	২১	২৪	১১	১২	১৪	৭	৬
ডিসেম্বর ০৬	২৩	১৫.৫	১৮.৫	২০	২৩	১২	১৩	১৫	৯	১২
জানুয়ারি ০৭	২১.৫	১৫	১৪.৫	১৬.৫	২২	১২	১৩.৫	১৫.৫	২	১২
ফেব্রুয়ারি ০৭	২০	১৬	১৩.৫	১৯	২১	১২	১৪	১৬	১২	১২
মার্চ ০৭	১৯.৫	১৩	১৩.৫	১৯	২০	১২.৪	১৪.৫	১৬.৫	১২	১৪